আবুদের এ্যাডভেঞ্চার

র-নগরের আজব সার্কাস

নবেম্বরের শুরু থেকেই হিমালয়ের কনকনে ঠাণ্ডা বাতাস উত্তরের ঝাউবন কাঁপিয়ে র-নগরের ওপর দিয়ে বয়ে যেতো। নবেম্বরের মাঝামাঝি আমাদের স্কুলের বছর শেষের পরীক্ষাটি হয়ে যাওয়ার পর একটানা দুমাস বড়দিনের ছুটি। ডিসেম্বর শুরু না হতেই পৌষমেলার দল আসা শুরু করতে র-নগরে। পাহাড়ী পথ ধরে দূর-দূরান্ত থেকে হরেক-রকম লোকজনেরা ঘোড়া, গরু আর মোষের গাড়িতে ডিং ডং ঘন্টা বাজিয়ে র-নগরের মড়াখেকোর মাঠে এসে জড়ো হতো। মেলার একমাস নিজেদের খেয়ালখুশি মতো চলতে কেউ আমাদের বারণ করতো না। করলেই-বা শুনছে কে! বড় জেঠু নিজেই তো অপেরা পার্টির তাঁবুতে পড়ে থাকেন সারাদিন। ছোটবেলায় নাকি বড় জেঠু যাত্রা দলে রাণি সাজতেন।

সেবার পৌষমেলায় নতুন এক সার্কাস পার্টি এসেছিলো। পাঁচটা ঘোড়ার গাড়ি আর চারটা মোষের গাড়িতে বড় বড় বাক্স, খাঁচা আর হরেক রকমের মালপত্র বোঝাই হয়ে সার্কাসের দল যখন সেন্ট জন স্ট্রিট ধরে র-নগরে ঢুকলো, তখন ওদের দেখার জন্যে গোটা শহরটাই যেন ভেঙে পড়লো। দলের সবার আগে হাতির পিঠে রঙচঙে এক লিকপিকে জোকার টিনের চোঙা ফুঁকে বলছিলো–

আসিতেছে! আসিতেছে!! আসিতেছে!!! আপনাদের শহরে এই প্রথম! এই প্রথম!! এই প্রথম!!! দি গ্রেট বনমালী সার্কাস (তিনবার)। সপরিবারে আসুন এবং উপভোগ করুন (তিনবার)।

এরপর জোকারটা হাতির পিঠে নেচে-কুদে ডিগবাজি খেয়ে চোঙা ফুঁকে একনাগাড়ে বলে গেলো সার্কাসে কী কী খেলা দেখানো হবে।

আমি, বিজু, আর রামু ছাদের উপর থেকেই দেখতে পেয়েছিলাম। সার্কাসের দল যখন সেন্ট জন স্ট্রিটের মোড় ঘুরে দামপাড়া দিয়ে মড়াখেকোর মাঠের দিকে এগিয়ে গেলো, তখন আমরা তিনজন তীরের বেগে সেদিকে ছুটলাম। আমাদের মতো অনেকেই মিছিল করে সার্কাস পার্টির সঙ্গে মড়াখেকোর মাঠের দিকে যাচ্ছিলো। সবাই বলাবলি করছিলো র-নগরে আগে কখনও এত বড় সার্কাস পার্টি আসেনি।

মড়াখেকোর মাঠে তখন মেলার জন্যে দোকানপাট বানানো হচ্ছিলো। এরই মধ্যে মোহিনীমায়া বায়স্কোপ কোম্পানি, ভাণ্ডারী অপেরা পার্টি আর ব্রাহ্মণবাড়িয়ার পুতুল নাচের দল এসে গেছে। ওদের

ঝরঝরে গাড়ি, পেটমোটা বেতো ঘোড়া আর রোগা ডিগডিগে গরুদের পাশে বনমালী সার্কাসের তেজী টগবগে ঘোড়া, খাঁচার ভেতর ডোরাকাটা আস্ত বাঘ, জমকালো তাঁবু, গণ্ডাগণ্ডা পোষাক আর সরঞ্জামের বাক্স দেখে ঠিক করলাম এবার আর বায়স্কোপ নয়, বায়স্কোপের পয়সা দিয়ে সার্কাস দেখবো আমরা।

সার্কাসের মালিকের নাম দেখেছিলাম হ্যাণ্ডবিলে রঙিন কালিতে ছাপানো আসিতেছে, আসিতেছে, ইত্যাদির নিচে মোটা হরফে লেখা ছিল?

শ্রী বনমালী বাড়ুরী

ম্যানেজার প্রোপ্রাইটার

দি গ্রেট বনমালী সার্কাস

প্রথমদিনই তার সঙ্গে দেখা হয়ে গেলো। সার্কাসের কেউ তাঁকে ডাকছিলো বাড়ুই বাবু আর কেউ স্যার স্যার বলে হন্তদন্ত হয়ে ছুটোছুটি করছিলো। মোটাসোটা থলথলে শরীর, সারাক্ষণ হাসি হাসি মুখ, ভোঁতা চ্যাপটা নাক আর কুতকুতে মার্বেলের মতো দুটো চোখ। হাসিমুখে অনবরত পান চিবুচ্ছিলেন বাড়ুই মশাই।

বাঘের খাঁচার পাশে আমাদের দেখে বাড়ুই মশাই মোমের মতো মোলায়েম গলায় বললেন–হ্যাঁ গো বাছা, তোমরা কাদের বাড়ির ছেলে গো?

আমি বড় জেঠুর নাম বললাম। শুনে বাড়ুই মশাই একগাল হাসলেন–ওমা, তাই নাকি গো! তার কথা আমি ভগবতী সার্কাস পার্টির কাছে কত শুনেছি! ভারি সদাশয় ব্যক্তি তিনি। তাঁকে বোলো, দয়া করে একবারটি যেন আমার তাবুতে পায়ের ধুলো দেন। এরপর বাড়ুই মশাই আমাদের হাতে একতাড়া হ্যাণ্ডবিল খুঁজে দিয়ে বললেন, এগুলো বাছা তোমাদের পাড়ার জন্যে। ছোটদের হাফ টিকেট। দেখতে এসো কিন্তু।

মেলা শুরু হতে আরও সাতদিন। বনমালী সার্কাসের তৈরি হতে দিন পাঁচেক লাগবেই। সারা বিকেল মড়াখেকোর মাঠে কাটিয়ে সন্ধ্যেবেলা বাড়ি ফেরার পথে বিজু বললো, সার্কাসের মালিকটা কি ভালো মানুষ দেখেছিস? ভগবতী সার্কাস পার্টিকে এত বলার পরও কখনও কি হাফ টিকেট দিয়েছে? বলে কিনা অর্ধেকের বেশি মানুষকে তাহলে হাফ টিকেট দিয়ে আমাদের লালবাতি জ্বালতে হয়। এর জন্যেই তো বায়স্কোপ দেখা। নইলে যাই বলিস আমার কিন্তু সার্কাস দেখতে বেশি ভালো লাগে।

বিজুর কথাগুলো মিথ্যে নয়। বায়স্কোপের চেয়ে চোখের সামনে জলজ্যান্ত বাঘের সার্কাস ঢের ভালো। বাড়ি গিয়ে জেঠুকে বনমালী বাড়ুইর কথা বললাম। আমাদের ভীষণ রাগী বড় জেঠু তাঁর প্রশংসার কথা শুনে গলে গিয়ে বললেন, বাড়ুই মশাইকে বলিস কাল আমার অন্য একটা কাজ আছে, পরশু যাবো।

আমাদের চিলেকোঠার ঘরে ঢুকে রামু বললো, বড় জেঠুর ভাবসাব দেখে মনে হচ্ছে এবার বোধহয় তিনি বাড়ুই মশাইর তাঁবুতে আড্ডা জমাবেন। ভাণ্ডারী অপেরার আড্ডা মাঠে মারা গেল।

আমি মুখ টিপে হেসে বললাম, আসলেই মাঠে, মড়াখেকোর মাঠে!

শুনে রামু আর বিজু একসঙ্গে হেসে উঠলো।

সার্কাস শুরু হওয়ার আগেই বাড়ুই মশাই র-নগরের বুড়োদের সঙ্গে চমৎকার ভাব জমিয়ে ফেললেন। দিদা বললেন, এসব হলো সার্কাসে লোক জমানোর ফন্দি। র-নগরের ছেলেরা যদি এরপর রোজ সার্কাস দেখতে চায় বড়োরা আর বারণ করতে পারবে না। আমি বাছা তোমাদের বলে রাখলাম, একবারের বেশি দুবার সার্কাসের তাঁবুতে তোমরা ঢুকতে পারবে না। ওদের দলে অনেক অসভ্য মেয়েছেলে থাকে।

বিজু ঘোঁৎ ঘোঁৎ করে বললো–বা রে নিজের ছেলেকে বারণ করতে পারছো না? বাড়ুই মশাই যদি বিনে পয়সায় সার্কাস দেখায় তাহলেও বুঝি দেখতে পারবো না?

দিদা হেসে বললেন, ওরে বোকারাম, বিনে পয়সায় কেউ কি কখনও দেখায়! দেখবি তোমাদের দিয়ে এটা-সেটা করিয়ে নেবে। তারপর হয়তো একদিন দেখাবে।

রামু আমার কানে কানে বললো, বিনে পয়সায় সার্কাস দেখার জন্যে এটা-সেটা করতে আমাদের আপত্তি থাকা উচিত নয়।

আমি মাথা নেড়ে সায় জানালাম।

.

২.

লোক বটে বনমালী বাড়ুই! কয়েকদিনের মধ্যেই র-নগরের সবাইকে মাতিয়ে ফেললেন। শুরু হওয়ার প্রথম দিনই আমরা সার্কাস দেখেছিলাম। কী দারুণ সব দড়ির খেলা। এসব খেলা আগে শুধু বায়স্কোপে দেখেছিলাম। চোখের সামনে জলজ্যান্ত মানুষকে অত উঁচুতে শূন্যে ডিগবাজি খেতে দেখে মাথার চুল খাড়া হয়ে গেলো। মিস শকুন্তলার দড়ির ওপর ছাতা দোলানো নাচ দেখে চোখ দুটো ঠিকরে বেরিয়ে আসতে চাইলো। শেরালী নামের দশাসই লোকটা তেজী বাঘটাকে পোষা বেড়ালের মতো

বানিয়ে ওটাকে দিয়ে যা খুশি তাই করালো। আর প্রত্যেক খেলার শেষে সেই লিকপিকে জোকারটা পুরো খেলা আবার নকল করে সবাইকে হাসাতে পেটে খিল ধরিয়ে দিলো। সব খেলা শেষ হবার পর সবাই একবাক্যে বললো–সার্কাস যদি দেখতে হয় তা এমনটিই দেখা উচিত। ভগবতী সার্কাস পার্টি এত বছর ধরে কী সব রদ্দি মাল চালিয়ে গেছে! প্রাণ জুড়োনো সার্কাস দেখিয়েছে বনমালী বাড়ুই।

কথাগুলো মোটেই বাড়িয়ে বলা নয়। রাতে লেপের নিচে শুয়ে আমরা সার্কাসের কথা ভেবে ঘুমোতে পারিনি। বিজু একসময় বললো, হ্যাঁরে, দিদা যে বললো, ওদের এটা-সেটা করে দিলে নাকি বিনে পয়সায় সার্কাস দেখাবে? কাল গিয়ে বলবি নাকি!

আমি বললাম, ওদের নিজেদেরই কতো লোক রয়েছে। বাড়ুই মশাইর বয়ে গেছে। তোকে দিয়ে কাজ করাতে।

রামু একটু বিরক্ত হয়ে আমাকে বললো, তুই সবটাতেই বাগড়া দিস আবু। চেয়ে কাজ নেয়ার কী দরকার। রোজ তাঁবুর পাশে ঘোরাফেরা করলে কিছু একটা কাজ দিয়েও

তো ফেলতে পারে! আমরা তো হ্যাণ্ডবিল বিলি করতে পারি।

বিজু বললো, মোদ্দা কথা আবার সার্কাস দেখতে হবে।

পৌষমেলাতে আগে যারা আসতো তাদের ভেতর ভগবতী সার্কাস পার্টি ছাড়া এবার আর সবাই এসেছে। হাজার বাতির আলোয় মড়াখেকোর মাঠ বরাবরের মতোই ঝলমল করছে। র-নগরের বাইরে থেকে দূর-দূরান্তের লোকজন মেলা দেখতে আসছে। জিনিসপত্রও প্রচুর বিক্রি হচ্ছে। কিন্তু আমাদের তিনজনের মন কেড়ে নিয়েছিলো বাড়ুই মশাইয়ের সার্কাস পার্টি। রাতে ঘুম হলো খুবই সামান্য। ঘুমের ভেতরও আমরা তিনজন সার্কাসের স্বপ্ন দেখলাম।

পরদিন সকাল থেকেই আমরা দি গ্রেট বনমালী সার্কাসের তাঁবুর আশপাশে ঘুর ঘুর করতে লাগলাম। বাড়ুই মশাই আমাদের দেখে একবার মুচকি হেসে বললেন, সার্কাস কেমন দেখলে গো বাছারা?

আমরা সবাই কোরাসে বললাম, দারুণ মজার।

রামু বললো, আপনার কোনো তুলনাই হয় না।

বিজু বললো, বার বার শুধু দেখতে ইচ্ছে করে।

বাড়ুই মশাই একগাল হেসে বললেন, বেশ বলেছো! একেই বলে প্রাণ জুড়ানো কথা। সায়েবদের ইস্কুলে তোমাদের কী সুন্দর কথা বলতে শিখিয়েছে! আমার দলের ছোঁড়াদের দেখো না, কি চ্যাটাং চ্যাটাং কথা বলে। শুনলে পিত্তি জ্বলে যায়। এই বলে হঠাৎ বাড়ুই মশাই গলা তুলে চিৎকার করে

উঠলেন, এই ফড়ে হারামজাদা! আবার ঘোড়ার দানা চুরি করে খাচ্ছিস! দাঁড়া তোর পিঠে আমি আস্ত খড়ম ভাঙবো।

বাড়ুই মশাই তার বিশাল বপু নিয়ে খড়ম পায়ে চেঁচাতে চেঁচাতে ছুটে গেলেন ঘোড়াদের আস্তাবলের দিকে। আমরা তিনজন হাসি চেপে অবাক হয়ে তাকিয়ে দেখি সেই লিকপিকে জোকারটা বাড়ুই মশাইকে আসতে দেখে চোখের পলকে কোথায় যেন কর্পূরের মতো উবে গেলো।

জোকারটার নাম তাহলে ফড়ে। বেচারার দুঃখ দেখে আমাদের ভারি মায়া হলো। বাড়ুই মশাই তখনও ছুটছিলেন।

রামু বললো, আহা বেচারা, ঘোড়ার দানা খেয়েছে বলে এভাবে বকতে আছে? খিদে না পেলে ওসব রাবিশ যেন কেউ খায়!

বাড়ুই মশাইর ওপর আমারও রাগ হলো। বললাম, যতটা ভালো মনে করেছিলাম–

আমার মুখের কথা মুখেই রইলো। কথা শেষ হবার আগেই দেখি বাড়ই মশাই আস্তাবলের কাছে দড়াম করে আছাড় খেয়ে পড়েছেন। আর সঙ্গে সঙ্গে চারদিক থেকে সার্কাসের লোকেরা–ওরে ধর ধর, গেল গেল, আহা কেমন করে হলো, এসব বলতে বলতে আস্তাবলের দিকে ছুটতে লাগলো। আমরাও কোনো রকমে হাসি চেপে বাড়ুই মশাইকে দেখতে গেলাম।

ততোক্ষণে শেরালী আর তার একগণ্ডা দশাসই পার্টনার মিলে বাড়ুই মশাইকে টেনে তুলেছে। সারা গায়ে কাদার ছড়াছড়ি। মুখখানা দারুণ দেখাচ্ছিলো। সেই অবস্থাতেই বাড়ুই মশাইর মুখ দিয়ে তুবড়ির মতো গালি বেরুচ্ছে–আসুক ফড়ে হারামজাদা। ওকে আমি শূলে চড়াবোয় ফাঁসিতে ঝোলাবো–অ্যাঁ! আমার সঙ্গে মামদোবাজি।

হঠাৎ গালি থামিয়ে তিনি শেরালীকে ধমক দিলেন–আমাকে এভাবে ধরে রেখেছিস কেন? আমাকে তোরা ডাকাত ভেবেছিস নাকি। সব কটা আমাকে পাগল করে ছাড়বে। নাহ, এই আমার শেষ। আমি আর এসবের মধ্যে নেই। এবারই কাজে ইস্তফা দিয়ে ঘরের ছেলে ঘরে ফিরে যাবো। ওস্তাদকে তখনই বলেছিলাম বেতো শরীরে আমাকে আর–এই বলে হঠাৎ চারপাশে বাইরের লোকজন দেখে বাড়ুই মশাই ওদেরকে নিয়ে পড়লেন–অ্যাঁ, এসব কি? আমাকে কী বাছা সার্কাসের সঙ পেয়েছো! এখানে এত ভিড় কিসের? অ্যাঁ, এতে ভিড় কিসের?

আমরা তিনজন পেছন থেকে চুপি চুপি সরে গিয়ে একছুটে বায়স্কোপ কোম্পানির তাঁবুর কাছে এসে হেসে হেসে গড়িয়ে পড়লাম। রামু বললো–বাড়ুই মশাই যা দেখালো, তা এর পাশে ফড়ের জারিজুরি সব পানসে মনে হচ্ছে।

বিজু হি হি করে হাসতে হাসতে বললো, আজ ফড়েকে না পাওয়া গেলে বাড়ুই মশাইকেই জোকার সাজতে হতে পারে। কি দারুণ রিহার্সেল দিলেন!

.

৩.

দুপুরে বাড়ি ফেরার পথে দেখি আমাদের পাঁচিলের পাশে দেবদারু গাছের তলায় বসে ফড়ে ফোৎ ফোঁৎ করে কাঁদছে। কাছে গিয়ে জিজ্ঞেস করলাম, ও ফড়ে, তুমি কাঁদছো কেন?

পকেট থেকে নোংরা রুমাল বের করে চোখ, মুখ, নাক ঝেড়ে ফড়ে ধরা গলায় বললো, কেন বাছা, নিরালায় বসে দু দণ্ড কাঁদবো, নাকি তাও শান্তিতে পারবো না?

আমি বললাম, আহা ফড়ে তুমি অতো চটছো কেন? আমরা তো তোমার ভালোর জন্যেই বলছি। তুমি তো দেখো নি। বাড়ুই মশাই তোমাকে মারতে গিয়ে আস্তাবলের কাছে কেমন আছাড়টাই না খেলেন! সাতদিন আর বিছানা ছেড়ে উঠতে হচ্ছে না।

তাই নাকি! আহ্লাদে আটখানা হয়ে ফড়ে বললো, কী সুখের কথা শোনালে ভাই! তোমাদের মুখে ফুলচন্দন পড়ুক!

রামু বললো, বাড়ুই মশাই তোমার ওপর দারুণ চটেছেন। বললেন, তোমাকে নাকি ফাঁসিতে ঝোলাবেন।

ফড়ে রেগে গিয়ে বললো, কী? আমাকে ফাঁসিতে ঝোলাবে? দেখা যাবে কে কাকে ফাঁসিতে ঝোলায়। ওই চর্বির পিপেটা সারা জীবনে যত পাপ করেছে দশ বার ফাঁসিতে ঝোলালেও ওর সাজা পুরো হবে না।

অবাক হয়ে বললাম, সে কি ফড়ে! বাড়ুই মশাই আজ যদি তোমাকে না বকতেন, তাহলে তো আমরা ধরেই নিয়েছিলাম তার মতো ভালো লোক আর হতে পারে না।

ফড়ে গম্ভীর হয়ে বললো, তোমরা তো বলবেই। ওকে কতটুকুই-বা চেনো। ওর মতো পাজি লোক সারা ভূ-ভারতে আর দ্বিতীয়টি নেই। আমার বাপকে ঠকিয়ে ও।

এটুকু বলে ফড়ে আমাদের জুলজুলে চোখের দিকে তাকিয়ে চুপ করে গেলো। নোংরা রুমালে চোখটা ভাল করে মুছে দাঁড়িয়ে হঠাৎ বিরক্ত হয়ে বললো, তোমরা তো বাপু কম নও! পটিয়ে পটিয়ে আমার কাছ থেকে সব কথা বের করে নিতে চাও? তোমরা যে ওর সঙ্গে ভাব জমিয়েছে সেটা বুঝি আমি জানি না ভেবেছো? এই বলে ফড়ে চলে যাবার জন্যে পা বাড়ালো।

আমি সঙ্গে সঙ্গে বললাম, ও ফড়ে, বাড়ুই মশাইর ওখানে যাচ্ছো নাকি! শেরালীরা যে তোমাকে দুরমুশ পেটা করবে।

ফড়ে ঘুরে দাঁড়িয়ে বিরক্ত হয়ে বললো, বাছা, গরিব হয়ে যখন জন্মেছি তখন বড়লোকদের লাথি ঝাঁটা খেয়েই তো আমাদের বাঁচতে হবে। কত আর পেটাবে! নুলো করে দিতে তো আর পারবে না! তাহলে খেলা দেখাবে কে? মার খাওয়া আমার সয়ে গেছে। বাপটা যেদিন চোখ বুজেছে, সেদিন থেকেই আমার দুর্ভোগের শুরু। কী করে খাবো বলো?

ফড়ের কথা শুনে আমার দুঃখ হলো। যে লোকটা সার্কাসে হাজার হাজার লোককে হাসায়–দেখে মনে হয় যার কোন দুঃখ থাকতে পারে না, অথচ বেঁচে থাকার জন্যে তাকেই কিনা এতো অত্যাচার সইতে হয়! আমি ফড়েকে বললাম, আজ দুপুরে তুমি আমাদের বাড়িতে খেয়ে যাও ফড়ে। বিকেলে বরং জেঠুকে বলবো তোমাকে না মারার জন্যে যেন বাড়ুই মশাইকে বলেন।

ফড়ে ফিক করে হাসলো–তাহলে তো ভালোই হয়। বাড়িতে কেউ বকবে না তো!

রামু বললো, কেউ বকবে না। আমরা দিদাকে বলবো।

ফড়ে খুশি হয়ে বললো, প্রাণটা বাঁচালে ভাই। যাই বলো শেরালীর শরীরে মায়াদয়া বলতে কিছুই নেই। যখন পেটায় তখন আর কাণ্ডজ্ঞান থাকে না। বাড়ুই বাবু তো ওকে প্রায়ই বলেন, অমন করে পেটাসনে রে। হাড়টাড় ভেঙে গেলে সঙের খেলা কে দেখাবে!

আমরা তিনজন বাড়ির ভেতরে গিয়ে দিদাকে ফড়ের সব কথা খুলে বললাম। দিদা শুনে ভারি দুঃখ পেলেন। বললেন, বনমালী বাড়ুই দেখছি একটা আস্ত চামার। ওকে একটা গামছা দিয়ে বল পুকুর থেকে নেয়ে আসুক। ততোক্ষণে আমি ভাত বাড়ছি।

রান্নাঘরের দাওয়ায় মাদুর পেতে দিদা ফড়েকে খেতে দিলেন। খেতে খেতে ফড়ে বললো, বাপের জন্মে এতো ভাল খাবার খাই নি মা।

দিদা বললেন, সার্কাসের লোকেরা বুঝি খেতে দেয় না?

ফড়ে বললো, কিলটা, চড়টা, লাথিটা হরদমই খেতে দেয়। নইলে কি আর ঘোড়ার দানা চুরি করে খাই! এমনি খাওয়ার সময় বাড়ুই বাবু বারণ করে দিয়েছেন, আমাকে যেন বেশি খেতে না দেয়। বেশি খেলে নাকি আমার গায়ে চর্বি জমবে। তখন নাকি আমি আর খেলা দেখিয়ে তোক হাসাতে পারবো না।

দিদা বিরক্ত হয়ে বললেন, কী বে-আক্কেলে কথা, শুনলে গা জ্বলে যায়। তুমি বাছা লজ্জা কোরো না। যেটা খেতে ইচ্ছে করে নিজ হাতে তুলে নিয়ে খাও।

খেয়ে উঠে হাত-মুখ ধুয়ে নোংরা রুমালে মুখ মুছে হেউ হেউ করে ঢেকুর তুলতে তুলতে ফড়ে দিদার কাছ থেকে পান সুপুরি চেয়ে নিয়ে খেলো।

দিদা বললেন, তোমার এই ফড়ে নামটি বাছা কে রেখেছে?

ফড়ে হেসে বললো, জ্ঞান হবার পর থেকে তো সার্কাস পার্টিতেই আছি। বাপ-মা কী নাম রেখেছিলো কী করে বলি। সার্কাসের সবাই এ নামেই ডাকে। আমার জন্মের তিন চার বছরের মধ্যে বাপ-মা দুজনেই পটল তুলেছেন।

দিদা মৃদু ধমক দিয়ে বললেন, ছিঃ বাছা! বাপ-মা সম্পর্কে ওভাবে বলতে নেই।

ফড়ে বললো, রাগ যে সামলাতে পারি না মা। নিজেরা যখন সগৃগে গেলেন, তখন আমাকে নিয়ে গেলে এত জ্বালা আর সইতে হতো না।

দিদা ছোট্ট একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, তোমার তো বাছা কিছুই বয়স হয়নি। খুব বেশি হলে আমাদের পন্টুর সমান হবে। মরার কথা তোমার ভাবা উচিত নয়। এই বলে দিদা ওকে বিশ্রাম নিতে বলে চলে গেলেন। যেতে যেতে দিদা বললেন, হাবুকে আমি বলে দেবো বাড়ই যাতে তোমাকে মারধোর না করে।

ফড়ে হাই তুলে বললো, তোমাদের দিদার মতো ভালো মানুষ আর হয় না।

.

৪.

খাওয়া দাওয়ার পর পান চিবোনো ফড়েকে বেশ খুশি খুশি দেখাচ্ছিলো। সুযোগ বুঝে আমি আসল কথা পাড়লাম–ফড়ে, তখন একটা কথা বলতে গিয়ে চেপে গিয়েছো। তুমি বাড়ুই মশাইর কোন পাপের কথা বলতে যাচ্ছিলে? তোমার বাবাকে তিনি কিভাবে ঠকিয়েছেন?

ফড়ে বললো, তোমরা আমাকে খেতে দিয়ে বলতে গেলে প্রাণে বাঁচিয়েছে। বাড়ুইর পাপের কথা তোমাদের বলতে পারি। আমি নিজে তো আর কিছুই দেখি নি। আমাদের সার্কাসের বুড়ি দাই

কামরাঙার মা-র কাছে শুনেছি, এই সার্কাস পার্টি নাকি আমার বাপই গড়েছিলো। বনমালী বাড়ুই আমার বাপের কোম্পানির ম্যানেজার ছিলো। আমার বাপ নাকি ওর পাপের কথা জানতো। তাই বাড়ুই বাবু একদিন বিষ খাইয়ে আমার বাপকে মেরে ফেলে নিজেই মালিক হয়ে বসেছে। আমার তখন তিন বছর বয়স। তার এক বছর পর একটা দুর্ঘটনায় আমার মা-ও মরলো। মা নাকি খুব ভালো দড়ির খেলা দেখাতে পারতো। ওই দুর্ঘটনাও নাকি বাড়ই বাবুর কারসাজিতেই হয়েছে। কামরাঙার মা অবশ্য এসব কথা এখন আর বলে না।

আমি বললাম, বাড়ুই মশাইয়ের পাপের কথা তুমিও তো জানো। সেই পাপের কথা বললে না যে!

ফড়ে বার বার ঘাড় নেড়ে বিষণ্ন গলায় বললো, না বাছা, ওটি মাপ করতে হবে। যতই লাথি ঝাঁটা খাই-জীবনের ওপর আমার কম মায়া নেই। তোমাদের ওসব বলে মা-বাপের মতো অসময়ে জীবনটি খোয়তে রাজি নই।

ফড়ের কথা শুনে ভারি দুঃখ পেলাম। ও আমাদের এখনও বিশ্বাস করতে চাইছে না। রামু বললো, ফড়ে, আমরা তোমার ভালো চাই।

ঈশ্বর তোমাদের মঙ্গল করুন। এই বলে ফড়ে আবার ঘাড় দোলাতে লাগলোকিন্তু এর বাইরে আমি একটা কথাও বলতে পারবো না। আমার বাপের কথাও তোমরা ভুলে যাও। আমিও তো ভুলে গেছি। পেটের দায় বড় দায়। প্রাণের দায় আরও বড় দায়। এই বলে ফড়ে ফোৎ কেঁৎ করে খানিকটা কেঁদে নিলো।

ফড়ের হাব-ভাব দেখে বুঝলাম ও কিছুতেই মুখ খুলবে না। মনে মনে ঠিক করলাম, ওকে আর বিরক্ত করবো না। আমার নিজেরাই এর রহস্য উদঘাটন করবো।

বিকেলে দিদার কথামতো জেঠু ফড়েকে সঙ্গে করে বাড়ুই মশাইর কাছে নিয়ে গেলেন। জেঠু আমাদের শুনিয়ে শুনিয়ে দিদাকে বললেন, ছোটদের এসবের মধ্যে থাকার কোনো দরকার নেই।

ছোটরা যেন এমনই সুবোধ বালক যে, বড়রা যা বলবে তাই শুনবে। আমাদের কতো কাজ! জেঠু চান পৌষমেলার দিনেও আমরা ঘরে বসে হাতের লেখা মকুশ করি।

জেঠুরা চলে যাবার কিছুক্ষণ পর আমরাও পেছনের দরজা দিয়ে বেরিয়ে পড়লাম। বায়স্কোপ কোম্পানির তাঁবুর কাছে এসে দেখি, বাড়ুই মশাই লাঠিতে ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে হেসে হেসে জেঠুকে কি যেন বলছেন। জেঠু হা হা করে হাসছেন আর ফড়ে লাজুক লাজুক মুখ করে গোবেচারা ভঙ্গিতে বাড়ুই মশাইর পাশে দাঁড়িয়ে রয়েছে। কী একটা কথা বলে বাড়ুই মশাই ফড়ের পিঠ চাপড়ে দিলেন। আর

তখনই ফড়ে তিড়িং বিড়িং লাফ মেরে সার্কাসের বড় তাবুতে ঢুকে গেলো। জেঠু আর বাড়ুই মশাই হাঁটতে হাঁটতে গল্প করতে লাগলেন।

বিজু বললো, জেঠু তাহলে ফড়েকে মার খাওয়ার হাত থেকে বাঁচিয়ে দিলো।

রামু বললো, বাড়ুই মশাই কিভাবে হাঁটছে দেখো। সাতদিনের আগে কোমর সোজা করে দাঁড়াতে পারবে না।

আমার মাথায় তখন ঘুরছিলো বাড়ুই মশাই কী এমন কাজ করেছেন বা করেন যা বললে ফড়েকে জীবন দিতে হবে! রামুকে বললাম, একটা গুরুতর বিষয় নিয়ে আলাপ করবো। চল কোথাও গিয়ে বসি।

রামু বললো, আমি জানি তুই কী বলবি।

লোকজনের ভিড় থেকে একটু দূরে ঘোড়ানিম গাছের নিচে বসে আমি বললাম, সকালে আছাড় খাওয়ার পর বাড়ুই মশাই কতগুলো কথা বলেছেন খেয়াল করেছিলি? আমার কিন্তু স্পষ্ট মনে আছে কাজে ইস্তফা দিয়ে ঘরের ছেলে ঘরে ফিরে যাবো। ওস্তাদকে তখনই বলেছিলাম–এসব কথা তিনি বলেছেন। আমার কথা হচ্ছে হ্যান্ডবিলের ছাপা অনুযায়ী দি গ্রেট বনমালী সার্কাসের মালিকই তো বাড়ুই। তিনি আবার কার কাছে কাজে ইস্তফা দেবেন? কথা শুনে এটাই তো মনে হয় যে বাড়ুই মশাইর একজন ওপরওয়ালা ও আছে। তিনি যাকে ওস্তাদ বলে মানেন।

আমার কথা শুনে রামু বিজু দুজনেই ভীষণ গম্ভীর হয়ে গেলো। কিছুক্ষণ পর রামু বললো, তোর কথা শুনে মনে হচ্ছে সার্কাস কোম্পানির আসল মালিক বনমালী বাড়ুইকে সামনে রেখে নিজে কোনো বিশেষ উদ্দেশ্যে আড়ালে থাকছে। আমাদের জানতে হবে উদ্দেশ্যটা কী।

বিজু বললো, কিন্তু ফড়ের কথামতো সার্কাসের এখনকার মালিক তো বাড়ুই।

আমি বললাম, তোর কথার ভেতর দুটো প্রশ্ন রয়ে গেছে। এক ফড়ে আসল ঘটনা কতদূর জানে, আর দুই, ফড়ে আমাদের সত্যি কথা বলেছে কিনা।

ফড়ের কথা যদি বিশ্বাস না করবি তো অযথা কেন বাড়ুইর পেছনে লাগছিস।

আমি বললাম, ফড়ের কথা একেবারে বাদ দিলেও আজ সকালে তিনি যতটুকু বলেছেন, পেছনে লাগার জন্যে সেটাই যথেষ্ট।

রামু বললো, আবু ঠিক বলেছিস, এর ভেতর একটা দারুণ রহস্যময় ব্যাপার রয়েছে। আমরা যদি বাড়ুই মশাইর পাপের রহস্যটা জানতে পারি, তাহলে ওকে ঠিকই পুলিশে ধরিয়ে দেয়া যাবে। তখন ফড়েই দি গ্রেট বনমালী সার্কাস পার্টির মালিক হবে।

বিজু হাসলো–তখন ওটার নাম পাল্টে দি গ্রেট ফড়ে সার্কাস পার্টি রাখতে হবে।

রামু মৃদু হেসে বললো, ফড়ে তখন নিশ্চয়ই নিজের নাম পাল্টাবে।

.

৫.

সেদিন আমরা আর বেশিদূর এগোলাম না। পরদিন সকালবেলা আবার সার্কাসের তাঁবুর আশেপাশে ঘোরাফেরা আরম্ভ করলাম। লক্ষ্য রাখলাম সন্দেহজনক কিছু ঘটে কিনা। নিজেদেরকে তখন খুব গুরুত্বপূর্ণ আর দায়িত্বসম্পন্ন মনে হলো। অথচ আগের দিন আমরা সেখানে ঘুর ঘুর করছিলাম বাড়ুই মশাইর অনুগ্রহের জন্যে, তিনি বিনে পয়সায় সার্কাস দেখাবার বদলে যদি কিছু একটা কাজ করতে দেন।

মেলার লোকজনের ঘুম তখনও ভাঙেনি। অথচ ভোরের কুয়াশা কেটে গিয়ে মড়াখেকোর মাঠ মিষ্টি সোনালি রোদে ঝলমল করছিলো। বাড়ুই মশাই অন্যদের মতো তাবুতে থাকেন না। চার ঘোড়ায় টানা একটা বড় কৌচে তিনি থাকেন। একদিন আমরা উঁকি মেরে দেখেছিলাম ভেতরটা দিব্যি ছিমছাম সাজানো ছোট্ট একটা ঘরের মতো। আমাদের নজর ছিলো বাড়ুই মশাইর কৌচের দিকে।

এ সময় হঠাৎ আমাদের চমকে দিয়ে একটা শুটকো লোক বিড়বিড় করে বকতে বকতে হন্তদন্ত হয়ে পাশ দিয়ে ছুটে গেলো। হেঁটেই যাচ্ছিলো লোকটা, কিন্তু এতো তাড়াতাড়ি হাঁটছিলো, দেখে মনে হলো যেন ছুটছে। বিড়বিড় করে কি বলছিলো সব বোঝা না গেলেও একটা কথা আমাদের তিনজনের কানে চাবুকের মতো আছড়ে পড়লো–কত্তা আস্ত রাখবেন না।

লোকটা ততোক্ষণে সার্কাসের তাঁবুর দিকে অনেকখানি এগিয়ে। আমরা তিনজন একে অপরের দিকে অবাক চোখে তাকালাম। রামু তড়াক করে দাঁড়িয়ে বললো, চল পেয়ে গেছি! এই লোকটাকে ফলো করলে নির্ঘাত কিছু জানে যাবে।

আমরা তিনজন লোকটার পিছু পিছু হাঁটতে লাগলাম। লোকটা এতই হন্তদন্ত হয়ে হাঁটছিলো যে, কোনো দিকে তাকাবার সময়ই পাচ্ছিলো না! নইলে মড়াখেকোর নির্জন মাঠে আমাদের এভাবে আসতে দেখে সন্দেহ করতো। যা ভেবেছিলাম তাই হলো। লোকটা গিয়ে সটান বাড়ুই মশাইর কৌচে গিয়ে ঢুকলো।

সার্কাসের কারও তখন ঘুম ভাঙেনি। অনেক রাত অব্দি খেলা দেখিয়েছে। আমরা জানি বেলা দশটা এগারোটার আগে কেউ উঠবে না। আমরা তিনজন চুপি চুপি গিয়ে বাড়ুই মশাইয়ের কৌচের গায়ে কান

পাতলাম। আর সঙ্গে সঙ্গে বাড়ুই মশাই-র গলা শুনলাম–দাঁড়া, দাঁড়া, অত ব্যস্ত হোনে। হড়বড় করে কি বলছিস কিছুই বুঝতে পারছি না। এক গেলাস জল খেয়ে সুস্থির হয়ে বোস।

একটু পরে ঢক ঢক করে পানি খাওয়ার শব্দ শুনলাম। লোকটা একটা লম্বা নিঃশ্বাস ফেলে বললো, সুস্থির হওয়ার কি সময় আছে কত্তা! বড় কত্তা রেগে টং হয়ে আছেন।

বাড়ুই মশাই বললেন, এখন বল তাহলে বড় কত্তা কী কী বলেছেন। তুই বলছিস মাল না পাঠানোর জন্যে কত্তা চটেছেন?

লোকটা বললো, শুধু কী চটেছেন! ঘটাকে তো এই খবর দেয়ার জন্যে বেধড়ক পেটালেন। আমাকে বললেন, সূয্যি ওঠার আগে তুই বাড়ুইর কাছে যাবি। ওকে বলবি মড়াখেকোর মাঠে ওকে ঘোড়ার ঘাস কাটার জন্যে পাঠাই নি। আমায় ঘেসেড়ার অভাব নেই। দশদিন ধরে ও বসে আছে মড়াখেকোর মাঠে। অথচ বর্ডারের ওপারে পার্টিকে বসিয়ে রেখে রোজ হাজার টাকা গুনোগার দিতে হচ্ছে। বারো ঘন্টার মধ্যে যদি মাল না যায় বলিস বড় কত্তা কাউকে আস্ত রাখবে না। মনে হচ্ছে বাড়ুই মেলা নিয়ে বেশি জমে গেছে। আজ রাতের মধ্যে মাল না পাঠালে ওকে আমি মাথা মুড়িয়ে সার্কাসের সঙের চাকুরি দেবো। সবার ওজন বুঝে কাজ করা উচিত।

বাড়ুই মশাই সব শুনে বিষণ্ণ গলায় বললেন, বড় কত্তার সবটাতেই কেবল তাড়াহুড়ো। সার্কাস একটু না জমলে কি এসব করা যায়। এমনিতেই নতুন এসেছি এই এলাকায়। ভগবতী সার্কাস পার্টির পাঁচটি হাজার টাকা দিয়ে তার জায়গায় দখল নিয়েছি। এলাকার লোকজনকে একটু হাত করতে সময় লাগবে না? তা মাল কে নেবে, তুই?

লোকটা বললো–আমাকে বড় কত্তা অন্য কাজ দিয়েছে। শেরালী আর পীরালীই তো নিতে পারবে।

বাড়ুই মশাই বিরক্ত হয়ে বললেন, তা তো পারবোই। সবে সার্কাসটা জমে উঠেছে। এ সময় বাঘের খেলাটা বন্ধ রাখলে কেলেঙ্কারি কাণ্ড হবে না?

লোকটাও বিরক্ত হয়ে বললো, তাহলে কি বড় কত্তাকে বলবো মাল যাবে না? বাড়ুই মশাই সার্কাসের চিন্তাতেই মগ্ন আছেন?

তুইও তো বেশ লোক দুগগগা। বাড়ুই মশাই গলায় বিরক্তি আর অভিমান মিশিয়ে বললেন, আমি কখন বললাম মাল যাবে না? আসলে তোরাই আমার নামে বড় কত্তার কাছে যা তা লাগিয়ে কান ভারি করিস। যা বলগে মাল যাবে। আজ রাত ঠিক আটটার সময় রামনাঙ্গা পাহাড়ের নিচে যেন—

.

৬.

বাড়ুই মশাইর কথা শুনে উত্তেজনায় আমাদের তখন দমবন্ধ হয়ে আসছিলো। কিন্তু কথার শেষটুকু শোনার আগেই পেছন থেকে কে যেন সাঁড়াশির মতো আমার গলা ধরে শূন্যে ঝুলিয়ে কৌচের পাশ থেকে সরিয়ে আনলো। শূন্যে হাত-পা ছুঁড়তে ছুঁড়তে তাকিয়ে দেখি, রামু আর বিজুর দশা ঠিক আমারই মতো। কখন যে শেরালী আর তার চ্যালা-চামুণ্ডারা আমাদের দেখতে পেয়েছে টেরই পাইনি।

শেরালী মোলায়েম গলায় বললো, কত্তার গাড়িতে আড়ি পেতে কী শোনা হচ্ছিলো?

বিজু পীরালীর মুঠোর ভেতর চিৎকার করছিলো, ছেড়ে দাও বলছি। ভালো হবে না। তোমাদের সব খবর নইলে ফাঁস করে দেবো।

এমন সময় কৌচের দরজা খুলে বাড়ুই মশাই বেরিয়ে এলেন। কী হলো, এখানে এত গণ্ডগোল কিসের? এই বলে বাড়ুই মশাই আমাদেরকে শূন্যে ঝুলতে দেখে অবাক হয়ে গলেন। ও কিরে শেরালী! চৌধুরীদের ছেলেদের এভাবে ধরেছিস কেন?

শেরালী বললো, ধরেছি কি আর সাধে কত্তা। কেউটের বাচ্চা সব। এতক্ষণ তোমার গাড়ির গায়ে কান লাগিয়ে এই তিন ছোঁড়া অনেকক্ষণ ধরে আড়ি পেতে কী যেন শুনেছে।

পীরালী ওর হাতে-ধরা বিজুকে দেখিয়ে বললো, এই ছোঁড়া বলে কিনা আমাদের সব খবর ফাঁস করে দেবে।

শেরালী আর পীরালীর কথা শোনার সঙ্গে সঙ্গে বাড়ুই মশাইর চেহারার মোলায়েম ভাবটুকু কর্পূরের মতো উবে গেলো। ঠাণ্ডা গলায় বললেন, ওগুলোকে আমার ঘরে নিয়ে আয়।

মেলার লোকজনরা তখনও কেউ ঘুম থেকে ওঠেনি। শেরালীরা আমাদের তিনজনকে শক্ত করে ধরে বাড়ুই মশাইর কৌচে গিয়ে ঢুকলো। দরজাটা বন্ধ করে বাড়ই মশাই আমাদের বললেন, তোমাদের তো বাপু ভদ্দর লোকের ছেলেপুলে বলেই জানতাম। এসব ঘোটলোকের স্বভাব কেন? ভদ্দর লোকের ছেলেরা কি কখনও আড়ি পাতে?

রাগে তখন রামুর ফর্সা চেহারা পাকা টম্যাটোর মতো লাল হয়ে গিয়েছিলো। ও বললো, আপনার কাছ থেকে আমরা ভদ্রতা শিখতে চাই না।

বাপ-মা যখন শেখাতে পারেনি তখন আমার কাছ থেকেই বা শিখবে কি করে? তবে আমি তোমাদের একটু অন্য ধরনের শিক্ষা দিতে চাই। তোমরা অনেক কিছুই জেনে গেছো। বেশি জানা যে ভালো নয় এই শিক্ষাটা তোমাদের দেয়া দরকার। এই বলে বাড়ুই মশাই একটু থামলেন। গলা ঝেড়ে সেই শুটকো

লোকটাকে বললেন, দেখলি তো কত ঝামেলার মধ্যে কাজ করতে হয়। তারপর শেরালীদের বললেন, ছোঁড়াগুলোকে পাঁচ নম্বরে নিয়ে মুখ, হাত-পা বেঁধে রেখে আয়। রাতে মালের সঙ্গে বস্তা ভরে পাচার করে দেবো।

শেরালীরা আমাদের আগের মতো শক্ত করে ধরে পাঁচ লেখা একটি নোংরা কৌচের ভেতর এনে ঢোকালো। শক্ত দড়ি দিয়ে পিছমোড়া করে হাত বাঁধলো, পা দুটো একত্র করে বাঁধলো, নোংরা দুর্গন্ধঅলা গামছা দিয়ে মুখ বাঁধলো। তারপর তিনজনকে তিন কোনায় তিনটে খুঁটির সঙ্গে বেঁধে বাইরে থেকে দরজা বন্ধ করে বেরিয়ে গেলো।

বিজু এতক্ষণ চুপ করে ছিলো। ওরা বেরিয়ে যেতেই ও ঝরঝর করে কাঁদতে শুরু করলো। রামুর মুখটা দেখলাম থমথম করছে।

বিজুকে ওভাবে কাঁদতে দেখে আমারও প্রথমটায় কান্না পাচ্ছিলো। পরে ভেবে দেখলাম, কেঁদে কোনো লাভ হবে না। বরং এদের কবল থেকে কিভাবে উদ্ধার পাওয়া যায় সে চিন্তাই করা উচিত। একবার যদি বেরোতে পারি তাহলে আর আমাদের পায়। কে! বাড়ুই মশাইকে–আর মশাই বলি কেন, বদমাশ বাড়ুইকে দেখিয়ে দেয়া যাবে কে কাকে শূলে চড়ায় আর ফাঁসিতে ঝোলায়!

বিজুটা ভীষণ ভয় পেয়ে গেছে। বাড়িতে দুপুরে না ফিরলেও কেউ খুঁজতে বেরোবে না। সবাই জানে এখন পৌষমেলা। এই একমাস আমরা স্বাধীন। রাতে যখন বাড়িতে খেয়াল হবে আমরা নেই–ততক্ষণে কোথায় চলে যাবো কে জানে। এরকম অবস্থায় বিশ্ব গোয়েন্দা সিরিজের নায়করা কী করতে ভাবতে চেষ্টা করলাম। কিন্তু অনেক ভেবেও এতখানি বেকায়দা অবস্থায় পড়েছে তেমন কাউকে খুঁজে পেলাম না। আমাদের মতো এভাবে কোনো সিরিজের কোনো ডিটেকটিভই কখনও বাঁধা পড়ে নি। আমাদের জুতোর হিলের ভেতর যদি ছুরিও লুকানো থাকতো এ অবস্থায় বের করা কারও পক্ষেই সম্ভব হতো না।

আরও কিছুক্ষণ পর সার্কাসের লোকজনদের ঘুম ভাঙতে শুরু করলো। রোজকার মতো হাসি-ঠাট্টা, গালাগালি আর চেঁচামেচির ভেতর দিয়ে দিনের কাজকর্ম আরম্ভ হয়েছে। আস্তাবলে ঘোড়াদের দানাপানি খাওয়াতে গিয়ে শেরালী নোংরা সব রসিকতা করছে। ওর গলা শুনে পিত্তি জ্বলে গেলো। মাঝে মাঝে পাজি বাড়ুইয়ের মোলায়েম গলাও শোনা যাচ্ছিলো।

একসময় গলায় কয়েক ভাঁড় দরদ ঢেলে বাড়ুইকে বলতে শুনলাম–হ্যাগা কামরাঙার মা, বুড়ো বয়সে কোথায় দু দণ্ড বসে আরাম করবে আর পরকালের কথা ভাববে, তা না তুমি থালা-বাসন মাজতে বসেছো। শরীরে আর কত সইবে বলো! শকুন্তলাকে বলো না বাসনগুলো মেজে দিক।

থালা-বাসনের ঝনঝন শব্দ মেশানো কামরাঙার মা-র গলা শুনলাম–সাতসকালে কানে অত মধু ঢালছো ক্যানে বাড়ুই মশাই? আমি কিন্তু বুড়ো বয়সে তোমাদের মাল-টাল নিয়ে কোথাও যেতে পারবো না। তারচে বাসন মাঝ ঢের সোজা।

বাড়ুই একটু বিরক্ত হয়ে ব্যস্ত গলায় বললো, আহ্ কামরাঙার মা! এত বয়সেও তোমার জ্ঞানগম্যি কিছু হলো না। এভাবে চেঁচিয়ে কথা বলছো কেন? রোজ-রোজ তো আর তোমাকে কেউ নিতে বলছে না। বুড়ো বয়সে বেঘোররা চাকরিটি খোয়াতে চাও নাকি!

বাড়ুইর কথা শেষ না হতেই কামরাঙার মা চেঁচিয়ে উঠলোচাকরির খোঁটা আর আমাকে দিওনি বাড়ুই মশাই। আমি তোমাদের খাই না পরি? কোন ড্যাকরা আমার চাকরি খাবে শুনি! হাটে হাড়ি ভেঙে দেবো না?

কামরাঙার মা-র চেঁচানি শুনে বাড়ুই ব্যস্ত গলায় বললো, আমার ঘাট হয়েছে বাপু, নাও, থামো এবার। নাটক করে লোক জড়ো কোরো না। সারাদিন তুমি যতো খুশি বাসন মাজো, আমি চললাম। থপ থপ করে আমাদের কৌচের পাশ দিয়ে বাড়ুই হেঁটে চলে গেলো।

বাসন মাজতে মাজতে কামরাঙার মা গজগজ করে পরে আরও কী বললো বুঝতে পারলাম না। রামুর দিকে তাকিয়ে দেখলাম কামরাঙার মা-র হাতে বাড়ুই-এর হেনস্তা ও বেশ উপভোগ করেছে।

সার্কাসের দলের এসব টুকরো টুকরো কথার ভেতর দিয়ে এটা আরো স্পষ্ট হচ্ছিলো যে, বনমালী বাড়ুই আর তার সাঙ্গপাঙ্গরা সার্কাস পার্টির আড়ালে দিব্যি জমিয়ে স্মাগলিং চালাচ্ছে।

দুপুরের দিকে একটু ঝিমুনি এসেছিলো। খুট করে শব্দ হতে দেখি শেরালী দরজা খুলে ভেতরে ঢুকলো। হাতে করে থালা-বাটিতে খাবার আর জগ ভরে পানি এনেছে। একগাল হেসে শেরালী বললো-আমাদের ছোট কত্তার এমনই দয়ার শরীর যে, পাঠাকে বলি দেয়ার আগ মুহূর্তেও খাওয়াতে ভোলেন না। এই বলে প্রথমে সে বিজুর বাঁধন খুলে দিলো। আদুরে গলায় বললো-একজন একজন করে খাও। চেঁচাবে তো কাল পর্যন্ত অপেক্ষা করবে না। ভোজালি দিয়ে এখানেই পেটটা ফাঁসিয়ে দেবো।

বিজুর চেহারা দেখে মনে হলো ওর খুব খিদে পেয়েছে। খিদে আমারও পেয়েছিলো। বিজু আমার দিকে তাকালো। ইশারায় ওকে খেতে বললাম।

বিজুর খাওয়া শেষ হবার পর শেরালী ওকে আগের মতো শক্ত করে বেঁধে রামুর বাঁধন খুলে দিলো। রামু বললো, আমার পেচ্ছাব পেয়েছে। বাইরে যাবো।

শেরালী পিটপিট করে রামুর দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে মোলায়েম গলায় বললো, মামদোবাজি, না? তোমাকে আমি পেচ্ছাব করানোর জন্যে বাইরে নিই আর তুমি চেঁচিয়ে মেলার সব লোক জড়ো করো! না বাছা! সেটি হচ্ছে না। ওই কোণে গিয়ে সেরে আসো, বাইরে যেতে পারবে না।

রামু আর কোনো কথা না বলে গম্ভীর মুখে খাওয়া আরম্ভ করলো। শেরালী তাই দেখে একগাল হেসে বললো, সারাদিন একফোঁটা দানাপানি পেটে পড়েনি, বলে কিনা পেচ্ছাব করবো। আসল কথা বাইরে যাব! এইটুকুন বুদ্ধি নিয়ে ছোট কত্তার পেছনে লাগতে গেছো! ধন্যি ছেলে বাপু!

রামুর পর আমার পালা। আমার শুধু হাতের আর মুখের বাঁধনই খুললো শেরালী। বললো, বার বার ভোলা আর বাধা ভালো লাগে না। কত্তা বলেছিলেন, খাওয়ানোর সময় বাঁধন খুলে দিস। তা বাপু পা দিয়ে তো আর খাচ্ছে না। পায়ের বাঁধন থাকলেও খেতে অসুবিধা হবে না।

রামুর পেচ্ছাব করার কথা শুনে আমারও মাথায় একটা বুদ্ধি এসেছিলো। শেরালী আমাদের খেতে দিয়েছে রুটি আর ডাল। আমি ভাবছিলাম ডালটা ওর চোখে ছুঁড়ে মেরে একছুটে বাইরে চলে যাবো। মেলার অনেকে এরই মধ্যে আমাদের চিনে ফেলেছে। বায়স্কোপ কোম্পানীর তাঁবুর কাছে গিয়ে প্রাণপণে একটা চিৎকার করতে পারলেই হলো। কিন্তু পায়ের বাঁধনটাই সব বানচাল করে দিলো।

সুবোধ বালকের মতো খাওয়া শেষ করতে হলো। খাওয়ার পর শেরালী আমাকে বাঁধতে বাঁধতে বললো–এই তো লক্ষ্মী ছেলের মতো ব্যবহার। টু শব্দটি পর্যন্ত নেই। রাত পর্যন্ত থাকো এভাবে। তারপর আবার দেখা হবে।

সবার বাঁধন আরেকবার ভালো করে দেখে শেরালী থালা-বাটি হাতে করে বেরিয়ে গেলো। যাবার সময় দরজার বাইরে তালা লাগাতে ভুললো না।

দেখতে দেখতে দুপুর গড়িয়ে বিকেল হলো। বিকেল গড়িয়ে সন্ধ্যে হবার পথে। অথচ বাড়ি থেকে কেউ খুঁজতে এলো না। পালাবারও কোনো পথ খুঁজে পেলাম না। সার্কাসের লোকজনদের বিশেষ কোনো সাড়াশব্দ পাচ্ছিলাম না। ওরা সবাই তখন দূরের বড় তাবুতে খেলার প্রস্তুতি নিচ্ছে। বিজুটা আবার ফোৎ ফোৎ করে কান্না শুরু করেছে। দূরে বসেও ওর কান্নার শব্দ শুনতে পেলাম। শব্দ শুনতে পেয়েই আমার মাথায় আরেকটা প্ল্যান এলো।

দূরে কোথাও বসে ফড়ে বেসুরো গলায় ঠুংরী গাইছিলো–কোয়েলিয়া মৎ পুকারো। সারাদিনে এই প্রথম ফড়ের গলা শুনলাম। ফড়ের গান শুনে দুঃখের ভেতরও হাসি পেলো। কিন্তু ফড়েকে আমাদের কৌচের কাছে পাই কী করে! ও কাছে না এলে সব প্ল্যানই যে ভেস্তে যাবে।

তখনই আমাদের কৌচের কাছে কামরাঙার মা-র গলা শুনলাম–হ্যাঁরে ফড়ে, সেই দুপুর থেকে তোকে খুঁজে মরছি। ছিলি কোথায়?

ফড়ে কাছে এসে বললো, ছিলাম আর কোথায়? শেরালীর পিটুনির ভয়ে বায়োস্কোপ কোম্পানির তাঁবুতে বসেছিলাম। খুঁজছিলে কেন?

কামরাঙার মা এরপর চাপা গলায় ফড়েকে যা বললো শুনে উত্তেজনায় আমার বুকের ভেতর ঢিব ঢিব শব্দ হতে লাগলো। কামরাঙার মা ফড়েকে বলছিলো, দুপুরে দেখলাম, শেরালী খাবার নিয়ে এই পাঁচ নম্বরে কাদের যেন খাইয়ে গেলো। আমার কাছ থেকে তিনটা থালাও চেয়ে নিয়েছে।

.

৮.

কামরাঙার মা-কে সেই মুহূর্তে মনে হলো, সে যেন বাড়ুইদের বাসন মাজা বুড়ি দাই নয়, স্বর্গ থেকে নেমে এসেছে কোনো দেবদূত আমাদের উদ্ধার করার জন্যে।

ফড়ে উত্তেজিত গলায় বললো, সে কি কামরাঙার মা? চৌধুরীদের ছেলেরা নয় তো? আমি দু বার ওদের বাড়িতে গিয়েছি, বললে মেলায় আছে। মেলায় কোথাও খুঁজে না পেয়ে ভাবছিলাম কোথায় গেলো। একটা জরুরী খবর, ওরাই শুধু পারতো থানায় জানিয়ে আসতে। আমি ঠিক করেছি কামরাঙার মা, যা হয় হবে, আমি আর এসব সহ্য করবো না।

আমি তখন ফড়ের মনোযোগ আকর্ষণের জন্যে নাকি স্বরে হু হু শব্দ করতে লাগলাম। শব্দ শুনে মনে হল ফড়ে যেন আঁতকে উঠেছে–এই তো শব্দ পাচ্ছি কামরাঙার মা! তোমরা কি ভেতরে আছো? উত্তেজনায় ফড়ের গলা দিয়ে কথা বেরুতে চাইছিলো না।

আমি আবার জোরে হুঁ শব্দ করলাম।

পেয়ে গেছি কামরাঙার মা! ফড়ে আহ্লাদে আটখানা হয়ে বললো, ওরা বলছিলো বাড়ুইর পাপের কিনারা করে ছাড়বে। নির্ঘাত বাড়ুই বুঝতে পেরে ওদের আটকে রেখেছে। আমি ঠিক জানি।

কামরাঙার মা ওকে বাধা দিয়ে বললো, ওসব ব্যাখান আমাকে পরে শোনাস ফড়ে। এখন ঘোড়াগুলোকে বের করবি কী করে সেটাই বল? চাবি তো শেরালীর কাছে।

ফড়ে খানিক ভেবে বললো, এ আর এমন কী কঠিন কাজ। তুমি শকুন্তলাকে এ কাজে লাগিয়ে দাও। তোমার কথা শকুন্তলা ফেলতে পারবে না। শেরালীকে কয়েকটা মিঠে কথা বলে ভাব জমিয়ে এক ফাঁকে চাবিটা পকেট থেকে তুলে নেবে।

কামরাঙার মা ছুটতে ছুটতে বললো, তুই ধারে কাছেই থাকিস।

ফড়ে কৌচের গায়ে মুখ লাগিয়ে চাপা গলায় বললো, ভেবো না আবুরা। এক্ষণি তোমাদের বের করে আনছি।

ভেতরে অন্ধকারে আমি রামু, বিজুর মুখ দেখতে পেলাম না। বিজু অনেক আগেই কান্না থামিয়েছে। শেষ পর্যন্ত ফড়ে আর কামরাঙার মা-ই আমাদের বাঁচালো! ভাবতে গিয়ে বার বার রোমাঞ্চিত হচ্ছিলাম।

প্রায় আধঘন্টা পরে কামরাঙার মা এসে চাপা গলায় ডাকলো–ফড়ে কোথায় গেলি?

অল্প দূরে কোথাও ছিলো ফড়ে। কামরাঙার মা-র ডাক শুনে ছুটে এলো।

কামরাঙার মা বললো, এই নে চাবি। জলদি কর। তোকে আবার চোঙা ফোকার জন্যে ওরা খুঁজছে।

ফড়ে চাবি নিয়ে ঝটপট দরজা খুললো। কোমর থেকে ছুরি বের করে বাঁধন কাটতে কাটতে বললো, তখনই বুঝেছিলাম মুখ-হাত-পা সব বেঁধে রেখেছে।

তিনজনের বাঁধন কাটার পর ফড়ে বললো, পেছন দিয়ে এক্ষুণি বেরিয়ে যাও। জেঠুকে বলল রাত আটটার সময়–।

আমি বাধা দিয়ে বললাম, আমরা সব জানি, তুমি সার্কাস চালিয়ে যাও। দরজাটা বন্ধ করে চাবিটা শেরালীর পকেটে রাখার ব্যবস্থা কোরো–যাতে এক ঘন্টার আগে ওরা টের না পায়।

.

৯.

পরের একটি ঘন্টা যে কিভাবে কেটেছিলো সে আর বলার নয়। আমরা ছুটে গিয়ে জেঠুকে সব বললাম। শুনে জেঠু-বলিস কী? এখনই থানায় চল। এই বলে দুহাতে আমাদের হিড়হিড় করে টানতে টানতে খড়ম পায়েই থানার দিকে ছুটলেন।

পথে বুড়ো হালদার দাদুর সঙ্গে দেখা। তিনি আমাদের ওভাবে ছুটতে দেখে বললেন, কী হলো, কোথায় যাচ্ছে তোমরা? তাঁর কথার জবাব না পেয়ে তিনি পেছনে ছুটতে ছুটতে বার বার জেঠুকে ডেকে বলতে লাগলেন–ও হাবু, কোথায় যাচ্ছিস? কী হয়েছে? বল না?

জেঠু একবার শুধু বললেন, থানায় এসো হালদার কাকা, সব বলছি।

থানায় বিশ্বাস দারোগা সব শুনে ছিটকে বেরিয়ে এলেন। তখনই লোকজন সব ডেকে একদলকে সাদা পোশাকে মড়াখেকোর মাঠে আরেক দলকে রামনাঙ্গা পাহাড়ে পাঠিয়ে দিলেন। জেঠু আর হালদার

দাদুকে বললেন, আপনারা ঘরে ফিরে যান। এরা আমার সঙ্গে থাকুক। রাতে আমি নিজে গিয়ে পৌঁছে দেব।

এরপরের ঘটনা আর বাড়িয়ে লাভ নেই। সার্কাসের দলে বনমালী বাড়ুই ছাড়া আরও তিনজন ছিলো এক বিরাট চোরাচালানীর দলের সঙ্গে জড়িত। সেই তিনজন শেরালী, পীরালী আর নুরালী ছাড়া আর কেউ নয়। অন্য সবাই ফড়ের বাপের আমলের লোক।

সেদিনের সার্কাসের খেলা ভণ্ডুল হয়ে গেলো। কামরাঙার মা কখনও হেসে কখনও কেঁদে বিশ্বাস দারোগাকে বললো, কিভাবে বাড়ুই তার সাঙ্গপাঙ্গ নিয়ে দলের সঙ্গে জুটেছে আর ফড়ের বাবা-মাকে ষড়যন্ত্র করে মেরেছে। কামরাঙার মা-র কথা শুনে সার্কাসের সবাই ফড়েকে বুকে জড়িয়ে ভেউ ভেউ করে কাঁদলো। ফড়েও কান্নায় কোরাসে গলা মেলালো। এক ফাঁকে আমাদের জড়িয়ে ধরে–আজ থেকে তোমরাই আমার বাপ। পায়ের ধুলো দাও বাপ–এই বলে আমাদের পা ধরতে এসে দারুণ হাসির কান্ড ঘটালো।

বনমালী বাড়ুই আর তার দলবলকে আগেই থানায় পাঠিয়ে দেয়া হয়েছিলো। রামনাঙ্গা পাহাড়ের নিচে থেকে দলের আরো দুটো লোক ধরা পড়লো। ধমক খেয়ে ওরা বড় কত্তার নাম ঠিকানাও বলে দিয়েছে।

বিশ্বাস দারোগা বললেন–এখন থেকে তাহলে সার্কাসের মালিক হচ্ছে ফড়ে!

ফড়ে লাজুক হেসে জিব-টিব কেটে বললো, তা কী করে হয় দারোগা মশাই! আমরা সবাই মিলে সার্কাসের মালিক হবো। লাভের বখরা আমরা সবাই সমান ভাগ করে নেবো।

একথা শোনার পর সার্কাসের লোকেরা ফড়েকে কাঁধে তুলে, শূন্যে ছুঁড়ে শিস বাজিয়ে লাফ ঝাঁপ দিয়ে রীতিমতো সার্কাসের খেলা দেখিয়ে ছাড়লো।

পরদিন ফড়ে নিজেই র-নগরে চোঙা ফুঁকে বললো–নতুন সার্কাস... নতুন সার্কাস... নতুন সার্কাস। আজ থেকে দি গ্রেট বনমালী সার্কাসের নাম পাল্টে রাখা হলো সবার সার্কাস। আসুন, দেখুন, উপভোগ করুন, সবার সার্কাস।

সেই রাতে ফড়ে বাঘের খেলা থেকে শুরু করে এমন সব কাণ্ড করলো, দেখে র-নগরের সবার চোখ ট্যারা হয়ে গেলো। ফড়ে সব খেলাই নকল করতে পারতো! কিন্তু সেদিন ও এমন কিছু খেলা দেখালো যা একেবারেই ওর নিজস্ব কায়দার। দেখে সবাই এক বাক্যে বললো, ফড়ের কাছে শেরালীরা নস্যির মতো।

এরপর থেকে সার্কাস দেখতে আমাদের কোনো পয়সা লাগেনি। বরং দূর-দূরান্ত থেকে যারা মেলা দেখতে আসতো তারা আমাদের তিনজনকেও দেখে যেতো। একবার তো ফড়ে বলেই ফেললো-তোমাদের দেখার জন্যে টিকেটের ব্যবস্থা করলে দিব্যি দু পয়সা কামানো যেতো।

আমাদের বাড়ুই-এর খপ্পর থেকে উদ্ধার করার জন্যে কামরাঙার মা-ও রাতারাতি বিখ্যাত হয়ে গেলো। সার্কাসের সবাই বললো, এখন থেকে কামরাঙার মা আমাদের সবার মা। ওই আমাদের ম্যানেজার, ও না থাকলে বাড়ুইর বদমাইশির কথা কিছুই জানা যেতো না।

আমাদের বাড়িতে দিদার সঙ্গে সার্কাসের নতুন ম্যানেজার কামরাঙার মা-র গলায় গলায় ভাব হয়ে গেলো। কামরাঙার মা অবশ্য নিজের কৃতিত্বের কথা কখনও স্বীকার করেনি। বলতো, আমি তো আজীবন সয়েই ছিলাম। আবুরা যদি নাক না গলাতে তাহলে হয়তো বাকি জীবনটাও মুখ বুজে কাটিয়ে দিতাম।

কামরাঙার মা আর ফড়ে যাই বলুক না কেন আমরা তো জানি ওরা না থাকলে আমরা তিনজন সেই রাতেই স্বর্গে চলে যেতাম। ফড়ে তবু বার বার বলবে, তোমরা আমায় নতুন জীবন দিয়েছে।

পৌষমেলার শেষে যাবার সময় ফড়ে আর কামরাঙার মা আমাদের বুকে জড়িয়ে ধরে এমন হাউমাউ করে কাঁদলো যে বিজু ও ওদের সঙ্গে গলা না মিলিয়ে পারলো না। আমাকে আর রামুকে অবশ্য কান্না চেপে রাখার জন্যে যথেষ্ট কসরত করতে হয়েছিলো।

সব ভালো যার শেষ ভালো

আমাদের পাড়ার ঠিক মোড়েই ছিলো শুটে হালদারের পানের দোকান। বুড়োরা বলে, গুটের মতো চমৎকার পান সাজতে পারে এমন লোক এ তল্লাটে দ্বিতীয়টি নেই। তাই সারাদিন মাছির মতো ভিড় জমে থাকতো গুটের দোকানে। তবে সবই ছিলো বুড়ো মাছি।

বুড়োরা গুটেকে যতই ভালো বলুক না কেন, আমাদের কিন্তু ওকে একেবারেই ভালো লাগতো না। লাগবেই বা কেন বলল! গুটে তার দোকানে পান আর বিড়ি-সিগারেট ছাড়া কিছুই রাখবে না। একদিন

গিয়েছিলাম লাটু ঘোরাবার লেত্তি কিনতে–অমনি গুটে খেঁকিয়ে উঠে বললো, ওসব আজেবাজে জিনিস আমি রাখি না।

বললেই হলো বাজে জিনিস! ভারি তো এক দোকান! গজবন্ধু স্টোর্স এর চেয়ে কতো ভালো! সেখানে লাটু, লেত্তি, বড়শি, টোপ, ঘুড়ি–সব পাওয়া যায়। একটু দূরে বলেই না গুটের দোকানে যাওয়া!

যেমনি গুটের দোকানের ছিরি, তেমনি বাহারে তার নিজের চেহারা! কুচকুচে কালো রঙ সারাক্ষণ ঘামে জবজব করছে, যেন এই মাত্তর একঘড়া আলকাতরা মাথায় ঢেলে এসেছে। মুখের একপাশে সুপুরির মতো বড় এক আঁব। তার ওপর কয়েকগাছি দাড়ি। চোখ দুটো পিটপিটে, থ্যাবড়া নাক, কদম ছাঁট চুল–সব মিলিয়ে গুটে এক যাচ্ছেতাই লোক।

গুটের আরেক বিচ্ছিরি স্বভাব হলো আমাদের ওপর খরবদারি করা। ধরো, স্কুলে খেলতে সন্ধ্যে হয়ে গেলো। বাড়ি ফেরার পথে জেঠুর বকুনির কথা ভেবে এমনিতেই আমি, বিজু আর রামু আধখানা হয়ে আছি। তার ওপর গুটে বাজখাই গলায় পেঁচিয়ে বলবে, রাত করে কোত্থেকে আসা হলো?

শুটের কথার জবাব দেয়ার বিন্দুমাত্র ইচ্ছে তখন থাকে না। সবাই তখন চুপিচুপি পড়ার টেবিলে বসে আঁক কষতে পারলে বাঁচি। জেঠু এলে বলে দিতে পারবোবারে, সেই কখন থেকে আঁক কষছি! আঁক কষতে দেখলে জেঠুও ভারি খুশি হন। বলেন–বেশ বেশ, শোবার আগে কদ্দূর করলি দেখিয়ে নিস।

জেঠুর এমন খুশি খুশি ভাবটা এক সেকেণ্ডে ভয়ঙ্কর রাগে পরিণত হয়, যদি শোনেন আমরা দেরি করে ফিরেছি। সেদিন বাড়ি ফিরতে সন্ধ্যাও পার হয়ে গেছে। গুটের দোকানে একগাদা ভিড়। তার ভেতর থেকে ও ষাঁড়ের মতো চেঁচিয়ে উঠলো, ফের দেরি করেছ?

রোজ রোজ এমন চেঁচানো আর কার ভালো লাগে বলো! তার ওপর এমনি লোকজনের সামনে অপমান করা। আমিও বললাম, তোমার এতো খবরদারি কেন গুটে? নিজের চরকায় তেল দাও!

এমন চমৎকার একখানা কথা বলতে পেরে বাহাদুরি নেবার জন্যে রামু আর বিজুর দিকে তাকালাম। রামুর ভাবখানা–বেশ হয়েছে! কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে সবাই ফুটো বেলুনের মতো চুপসে গেলাম যখন গুটে খেঁকিয়ে উঠলো-খুব যে কথা শেখা হয়েছে। দাঁড়াও, জেঠুকে বলে শায়েস্তা করতে হবে।

মুখ কালো করে তিনজন বাড়ি ফিরে আঁক কষতে বসলাম। বিজু মিনমিন করে বললো, আসলে তোর অমন করে বলাটা ঠিক হয় নি।

আমি ধমকে বললাম, মেলা বকিসনি বিজু। দেবো এক গাট্টা।

কথাটা শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গেই দেখি আমার আর রামুর কান দুটো জেঠুর দুহাতে ধরা। খুব আয়েশ করে কান ঝাঁকাতে জেঠু বললেন, ইস্কুলে এতক্ষণ কী করছিলি?

কথার জবাব দেবো কি, আমাদের মাথার তালু অবধি ঝিঁঝিম্ করছিলো। সবাই ট্যারা চোখে তারা দেখছি। বিজু তো আমাদের অবস্থা দেখে ভ্যাক করে কেঁদেই দিয়েছে। ভাগ্যিস কেঁদেছিলো। আর তাই শুনে ভেতরে থেকে দিদা বেরিয়ে এলেন। জেঠুর আয়েশ তখনও কাটে নি। দিদা দেখে তো এক ধমক-তোর আক্কেল আর কোনো কালেই হলো না হাবু। একশো দিন তোকে বারণ করেছি, ছেলেদের ওভাবে কান ধরে ঝাঁকাসনে, মাথার মগজ নড়ে যায়, স্মরণশক্তি কমে যায়। সে কথা আর মনে থাকে না।

জেঠিমা পাশের ঘর থেকে ফোঁড়ন কাটলেন–মনে আর থাকবে কী করে মা, আপনারা যে ছোটবেলায় কান ধরে ঝাঁকুনি দিয়ে দিয়ে স্মরণশক্তিটি লোপ পাইয়ে দিয়েছেন। সেজন্যেই তো এখন সবার....

জেঠু রেগেমেগে পাশের ঘরে গিয়ে জেঠিমাকে বললেন, তুমি বুঝি খুব দেখে এসেছিলে?

জেঠিমা বললেন, তা নাহলে কথা কেন মনে থাকে না? কবে থেকে বলছি আমার দোক্তা ফুরিয়ে গেছে, পশারীদের কাছ থেকে দুআনার বচ আর জষ্ঠিমধু এনো–।

জবাবে জেঠু গাঁইগুঁই করে কি যেন বললেন শুনতে পেলাম না। দিদা আমাদের খেতে ডাকলেন।

খেয়ে-দেয়ে সবাই লেপের নিচে গুটিসুটি মেরে শোবার পরও কানের ভেতর প্রজাপতি উড়তে লাগলো। রামু বললো, আমার কানটা অবশ হয়ে গেছে।

বিজু বললো, আসলে গুটেকে অমন করে না বললেই পারতি।

আমি বললাম, দাঁড়া না, এর শোধ যদি না নিই!

রামু অবাক হয়ে বললো, কার ওপর শোধ নিবি? জেঠুর?

আমি শক্ত হয়ে বললাম, না, গুটের ওপর।

দুদিন ধরে ভাবলাম, গুটেকে কেমন করে জব্দ করা যায়। অনেক ভেবে ঠিক করলাম, গুটের বারোমেসে পেয়ারা গাছটাকেই ধরবো। এক এক করে ওর পোষা কবুতরের ঝাঁক, খেদী নামের ন্যাড়া কুত্তাটা–কাউকেই বাদ দেবো না।

রামু আর বিজুকে বললাম, সব কটা পেয়ারা পেড়ে ফেলবো। খেদীকে দেখলেই গুলতি দিয়ে তাক করবো। আর ঝুঁটি ওয়ালা কবুতর ধরে ইভুকে দিয়ে তার বদলে স্ট্যাম্প নেবো।

ওরা শেষ দুটো পছন্দ করলো। কিন্তু পেয়ারা চুরির বেলায় খুঁত খুঁত করতে লাগলো। কবুতর যেখান থেকে খুশি ধরা যাবে। খেদীকে যখন-তখন তাক করা যাবে। কিন্তু পেয়ারা পাড়তে হলে যে ওর বাড়িতে যেতে হবে।

আমি বললাম, তাতে কি, মন্টিদের চালের ওপর দিয়ে ওর পাঁচিল টপকাবো।

এতেও ওদের পছন্দ হলো না। আমি তখন চটে গিয়ে বললাম, তাহলে ঘরে গিয়ে সেজদির আঁচলের তলায় বসে থাকো গে। ভীতু কোথাকার!

রামু শুনে ভয়ানক ক্ষেপে গেলোভীতু ভীতু করিস নে বলে দিলাম। গাট্টা মেরে মাথায় সুপুরি বানিয়ে দেবো। দরকার হলে তুই ঘরে বসে পচা পচা ডিটেকটিভ বই পড় গে!

আমি বললাম, যা জানো না তাতে নাক গলিও না। এখন তোমরা যাবে কিনা তাই বলো। গেলে এসো আমার সঙ্গে।

এই বলে আমি হন্ হন্ করে হাঁটতে শুরু করলাম। হাফ-স্কুল ছিল সেদিন। শেষ দুপুরে বাড়ির সবাই ঘুমিয়ে। গুটের দোকানটাও এ সময়ে ফাঁকা থাকে। সে বসে বসে হিসেব লেখে–কাকে কত বাকি দিলো, কোন দিন কাকে পয়সা দেবার জন্যে বলবে, কাকে আর বাকি দেবে না–এমনি সব বাজে কাজ।

রামু আর বিজু সঙ্গেই আসছিলো। গুটের দোকানের সামনে দিয়ে যেতে আড়চোখে তাকিয়ে দেখি গুটে পেন্সিলের শিষটা বার বার জিভে লাগিয়ে গম্ভীর হয়ে হিসেব লিখছে। আমাদের দিকে তাকিয়েও দেখলো না।

চুপিচুপি মন্টিদের পাঁচিল টপকে তিনজনেই পেয়ারা গাছটায় উঠে পড়েছি। মস্তবড় কাশীর পেয়ারা। বিজু বললো, আসলে পকেটে তো দুটোর বেশি রাখতে পারছি না।

আমি বললাম, মন্টিদের পাঁচিলের বাইরে যে ড্রামে ওরা ময়লা ফেলে ওটাতে ফেল। খুব টিপ করে মারিস, ড্রামের গায়ে যেন না লাগে।

বিজুকে বলাটাই সার হলো। ওর যে এমন যাচ্ছেতাই টিপ সে-কি আর আগে জানতাম! ভেবেছিলাম আমাদের সাথে থেকে ওর কিছু হয়েছে। কিন্তু সে গুড়ে বালি। ঠং করে মস্ত এক পেয়ারা গিয়ে ড্রামের গায়ে লাগলো।

ভাগ্যিস এ দিকটা নোংরা বলে লোকজন চলাফেরা করে না। বিজুকে খুব করে ধমকে দিলাম। রামু হঠাৎ ডেকে বললো, খেদীকে দেখেছিস? দেবো নাকি মাথা ফাটিয়ে?

খেদী ঠিক পাঁচিলের গা ঘেঁষেই বসেছিলো। লেজে ওর উকুন হয়েছে। তাই বার বার তিড়িং তিড়িং করে লেজের ডগা কামড়াতে চাইছিলো। রামু তাকে একটা পেয়ারা ছুঁড়ে মারলো।

টিপ বটে রামুর। ছোট সাইজের একটা ঠাস করে ফেঁদীর পিঠে গিয়ে পড়লো। আর তখনই খেদী এমন বিকট চিৎকার করে উঠলো, যেন কেউ চোখের সামনে থেকে তার লেজখানা কেটে নিয়ে গেছে।

বেশ কিছুক্ষণ চেঁচিয়ে খেদী যখন দেখলে কেউ আদর করে তার উকুনঅলা পিঠে হাত বুলিয়ে দিচ্ছে না, তখন চেঁচাতে চেঁচাতে গুটের দোকানের দিকে গেলো।

রামু বললো, একেই বলে এক ঢিলে দুই পাখি মারা।

আমরা সবাই কোরাসে হাসতে যাবো তখনই শুনি গুটের বাজখাই গলা–গাছে কে উঠেছে র্যা? বলেই খটাস খটাস খড়ম বাজিয়ে এদিকে আসতে লাগলো।

আমি তখনই–পালা বলে তিন লাফে গাছ থেকে পাঁচিল টপকে একছুটে একেবারে মড়াখেকোর মাঠে।

খানিক পরে হাঁপাতে হাঁপাতে রামুও এলো। বললো, একটু হলেই ধরা পড়েছিলাম আর কি!

আমি বললাম, গুটে দেখতে পায়নি?

রামু মাথা নেড়ে বললো, ও আসার আগেই আমি পাঁচিল টপকেছি।

বিজুটা আবার দেরি করছে কেন?

রামু পকেট থেকে একটা পেয়ারা বের করে বললো, এখনও মন্টিদের পাঁচিল টপকাচ্ছে হয়তো। ও তো বার বার ফেল না মেরে পাঁচিল টপকাতে পারে না।

রামু চকাম চকাম করে পেয়ারা খেলেও আমার কিন্তু বিজুর জন্যে ভাবনা হচ্ছিলো। অনেকক্ষণ কেটে গেলো। বিজু এলো না। রামু বললো, ওকি জানে আমরা মড়াখেকোর মাঠে থাকবো! দ্যাখগে বাড়ি বসে চার বানাচ্ছে।

তাই তো! আমি শুধু ভেবে মরি। বললাম, চল বাড়ি যাই।

যাবার পথে রামু মন্টিদের পাঁচিলের ধার থেকে পাকা পেয়ারাগুলো তুলে নিলো। বাড়ি এলে দিদা দেখে ভারি খুশি–কোথায় পেলি রে? চমৎকার জেলী হবে।

রামু দিব্যি মিথ্যে কথা বলে দিলো–ইভুদের বাগানে অনেক পেয়ারা পেড়েছে। তার থেকে কটা আনলাম।

দিদা বললেন, ওরা আবার কবে কাশীর পেয়ারা লাগালো? গেল আষাঢ়ে ওর মাকে বললাম, দুটো কলম বাঁধার জন্যে। দিব্যি বলে দিলো আমাদের বাগানে তো পেয়ারা গাছ লাগাইনি। দাঁড়া, ওর সাথে বোঝাঁপড়া করতে হবে। না দেবার হলে না। দিত। মিথ্যে বলার কী দরকারটা ছিলো।

দিদা বলেই যাচ্ছিলেন। রামু তাড়াতাড়ি সামনে থেকে সরে পড়লো। কে জানে কখন বেফাঁস কথা বেরিয়ে পড়ে। একটা মিথ্যের ধাক্কা সামলাতেই এতো!

দূর হোকগে ছাই দিদা আর কাশীর পেয়ারা। এদিকে যে বিজুকে কোথাও দেখছি । সব ঘরে তন্ন তন্ন করে খুঁজলাম। মা বললো, অমন ঘুরঘুর করছিস কেন? বিকেলে কোথায় একটু বাইরে ঘুরে আসবি তা নয়, ঘরের ভেতর শুধু ঘুর ঘুর করা!

বাইরে বেরিয়ে দেখি রামুরও মুখ কালো বললো, বিজুকে বাড়ির কেউ কোথাও পাঠায় নি।

আমি বললাম, নির্ঘাত গুটে হতচ্ছাড়া ওকে ধরে রেখে দিয়েছে।

রামু বললো, সাহস তো কম নয় থ্যাবড়ামুখোর!

আমি বললাম, ধাড়ি শয়তান!

রামু বললো, পাজির পা ঝাড়া!

তারপর দুজনে অকা সরকারের পুকুর ঘাটে বসে ওকে মনের সুখে গালি দিলাম। সব শেষে ঠিক করলাম গুটের কাছে যাওয়া উচিত। জেঠুকে যাতে না বলে সেরকম একটা ব্যবস্থা করতে হবে। দরকার হলে না হয় পয়সা দিয়ে দেবো। কত পেয়ারা তো বাদুড়েও খায়। আমরা নিলেই যেন দোষ!

গুটেকে গিয়ে ভাল মানুষের মতো বললাম, গুটে, বিজু কোথায়?

গুটে ভুরু কুঁচকে বললো, আমি কী করে বলবো?

রামু বললো, কেন, ও তোমার পেয়ারা পাড়তে আসেনি?

গুটে বললো, সে তো এসেছিলো দুপুরবেলা। তখন তো তোমরাও ছিলে।

আমার তখন মনে হল গুটে ভারি ভয়ানক এক চাল চালছে। গম্ভীর হয়ে বললাম, দেখ গুটে, তুমি ওকে মার খাওয়ানোর জন্যে বেঁধে রেখেছে। এ আমরা জানি। ওকে ছেড়ে দাও। আর কখনও ও পেয়ারা পাড়তে আসবে না।

গুটে বিরক্ত হয়ে বললো, কী জ্বালা, পেয়ারা খাবার জন্যে বেঁধে রাখবো কেন? আমি তো আরো ধরে ওকে গাছ থেকে নামিয়ে দিয়েছি। বললাম, দুদিন পর একঝুড়ি তোমাদের বাড়িতে রেখে আসবো। তখন ফেলে-ছড়িয়ে ইচ্ছেমতো খেয়ো। এখনও সব পাকে নি।

আমি ঠিক জানি গুটে মিথ্যে কথা বলছে। তাই বললাম, তাহলে বিজু কোথায় গেলো?

গুটে বললো, কেন বাড়িতে নেই?

আমি রেগে বললাম, থাকলে কি আর তোমার সাথে তামাশা করছি।

তাহলে দেখ কোনো বন্ধু-টন্ধুর বাড়ি গেছে কি না। আমার এখানে ভিড় জমিও না। খদ্দের আসার সময় হলো।

রামু বললো, চল ইভুদের বাড়ি দেখে আসি।

আমি যেতে যেতে বললাম, ইভুদের বাড়ি কেন যাবে?

রামু পেয়ারা চিবুতে চিবুতে সবজান্তার মতো জবাব দিলো–ও হয়তো ভেবেছে আমরা পেয়ারা বদলে স্ট্যাম্প নেবো বলেছি।

বিজুকে আমরা ইভুদের বাড়িতেও পেলাম না। কেন্দুদের বাড়িতেও খুঁজলাম। সেখানেও নেই। আমি তখন গুটের ওপর ভীষণ রেগে গেলাম। ও ছাড়া আর কেউ বিজুকে লুকিয়ে রাখেনি। রামু ওর সবজান্তা ভাবটা ভুলে গেলো। করুণ মুখে বললো, বিজুকে যদি না পাওয়া যায় তাহলে কী করবি?

আমি বললাম, ওকে খুঁজে বের করবোই।

রামু বলল, বাড়িতে কী বলবি?

আমি চুপসে গেলাম। তাই তো, বাড়িতে কি বলবো! রামু ভেবে বললো, আমি বলি কী বাড়িতে কাউকে বলে কাজ নেই। ওরা থানাতে খুঁজুক। আমরা আমাদের মতো খুঁজবো।

মাথা নেড়ে বললাম, তাই হবে।

বাড়িতে ঢুকে চুপচাপ পড়ার টেবিলে গিয়ে বসেছি। দিদা এসে বললেন, হারে, বিজু গেলো কোথায়?

আমি চুপ।

রামু বললো, আমরা কী জানি। ও তো আমাদের সঙ্গে যায় নি।

দিদা অবাক হয়ে বললো, সে কি রে! তাহলে গেলো কোথায়?

রামু বললো, দেখো গে কেউ হয়তো কোথাও পাঠিয়েছে।

দিদা ভেতরে গেলেন। আমি উঠে এক গ্লাস পানি খেলাম। বার বার গলা শুকিয়ে যাচ্ছে। ঠিকমতো কথা বলতেও পারছিলাম না।

দিদা ভেতরে যাবার পাঁচ মিনিট পরেই সারা বাড়িটা ব্যস্ত হয়ে উঠলো। বিজু কোথায়? সবাই শুধু এক প্রশ্ন। কেউ বললো, দুপুরে তো দেখলাম চিলেকোঠায় আচার চুরি করে খাচ্ছে। কেউ বললো, সেই বিকেল থেকেই দেখছি না, ভাবলাম সেজদি কোথাও পাঠালো বুঝি।

সেজদি সবাইকে খুব গালি দিলো–কিছু হারালে অমনি সেজদি। আমি ছাড়া যেন এ বাড়িতে আর কেউ থাকে না।

জেঠু সেজকাকে থানায় পাঠিয়ে নিজেও ছড়ি হাতে বেরিয়ে পড়লেন। আমাদের বলে গেলেন ওর বন্ধুদের বাড়িতে দেখে আয়। আমি আর রামু সটান গুটের দোকানে। ওকে বাইরে ডেকে বললাম, বিজু হারিয়ে গেছে।

শুনে গুটের মার্বেলের মতো চোখ দুটো যেন ঠিকরে বেরিয়ে আসতে চাইলো। আমি বললাম, অমন করে তাকিয়ো না গুটে। তুমি ওকে বকেছিলে?

গুটে বললো, আল্লার কিরে বলছি–ওকে আমি নিজে ধরে গাছ থেকে নামিয়েছি। বকবো কেন বলো? কত ফল বাদুড়-ভামে খেয়ে যায়। তাই বলে চৌধুরীদের ছেলেদের বকবো! তোমার বাবা যদি আমাকে টাকা না দিতো তাহলে এ দোকান করতে পারতাম? তোমরাই বলো, বিজুকে আমি বকতে পারি?

তবু আমার বিশ্বাস হলো না। গুটের চেহারা দেখে মনে হয় ও খুনও করতে পারে। নির্ঘাত ও বিজুকে লুকিয়ে রেখে ছেলেধরাদের কাছে বিক্রি করবে। আমি শক্ত হয়ে বললাম, গুটে, তুমি জানো বিজু কোথায়। তুমি বলছো না। তবে আমরা ওকে খুঁজে বের করবোই।

গুটেকে আর কোনো কথা বলার সুযোগ না দিয়ে রামুকে নিয়ে বাড়ি ফিরে এলাম। আমাদের শুকনো মুখ দেখে সবাই বুঝলো বিজু বন্ধুদের বাড়ি নেই। ভেতরে মা ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগলেন। শুনে আমারও কান্না পেতে লাগলো। দাঁতে দাঁত কান্না চেপে ভাবতে লাগলাম, বিজুকে কী করে উদ্ধার করা যায়।

সে রাতে আমরা কেউ খেলাম না। খিদেও ছিলো না। লেপ মুড়ি দিয়ে আমি আর রামু শুয়েছিলাম। টের পেলাম রামু ঘুমুতে পারছে না। অনেক রাতে জেঠু এলেন। জেঠিমাকে বললেন, দুপুরে শেষবার গুটের বাড়ি গিয়েছিলো পেয়ারা খেতে।

হঠাৎ রামু ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠলো। আমি বললাম, কাঁদছিস কেন রামু? আমার ভারি খারাপ লাগছে।

রামু ভেজা গলায় বললো, আজ ওকে পেয়ারা পাড়তে না নিলে তো এমন হতো না। বলে আবার ফুঁপিয়ে উঠলো।

আমি বললাম, চুপ কর রামু। নির্ঘাত গুটে ওকে চুরি করেছে। আজ না করলে আরেক দিন করতো।

রামু চুপ করলো। অনেক রাত অবধি আমরা জেগে রইলাম। শুধু বিজুর কথা ভাবলাম।

সকালে খবর পেয়ে থানা থেকে দারোগা এলেন। পাড়ার সবাইকে ডেকে জেরা করলেন। শেষে শুটকো রামধনিয়াকে ধরে নিয়ে গেলেন। ও নাকি ঠিকমতো কথার জবাব দিতে পারেনি।

আমরা ইস্কুলে যাবার নাম করে মড়াখেকোর মাঠে গিয়ে বসে রইলাম। অনেকক্ষণ ভেবে ঠিক করলাম–গুটের উপর কড়া নজর রাখতে হবে। চিলেকোঠা থেকে ওর দোকান দেখা যায়। রাতে আমরা সেখানে থাকবো।

বাড়িতে কেউ কিছু বললো না। সবাই মন খারাপ করে বসে আছে। আমরা চিলেকোঠায় বিছানা পাতলাম।

সারাটা বিকেল অচেনা কাউকে গুটের দোকানে দেখতে পেলাম না। তবে সন্ধ্যের দিকে কালো, মোটা, গোঁফঅলা একটা লোক এদিক-সেদিক চেয়ে গুটেকে কী যেন বললো। গুটে কিছুক্ষণ কথা বলে আমাদের বাড়িটা ইশারা করে দেখালো। ও জানতেই পারলো না যে, আমরা ওকে দেখছি।

মুশকো লোকটা গুটের দোকান থেকে আমাদের বাড়ির দিকে এলো। রামু কার্নিসে মাথা গলিয়ে দেখছিলো। আমি বললাম–অমন করে তাকিও না। লোকটা টের পেয়ে যাবে।

রামু মাথা সরিয়ে নিলো। একটু পরে দেখি লোকটা আবার গলির মাথায় গিয়ে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকলো। আমাদের বাড়িটা দেখলো। তারপর হন্ হন্ করে হেঁটে চলে গেলো।

রামু উত্তেজনায় কাঁপছিলো। বললো, কী করবি?

আমি বললাম, কাল সকালে দেখা যাবে।

দেখলি তো ব্যাপারটা?

হুঁ। আমি মাথা নাড়লাম।

সকালে ইস্কুলে যাবার পথেই গুটেকে বললাম, কাল যে লোকটা তোমার সঙ্গে কথা বললো, সে কে?

গুটে অবাক হয়ে বললো, কখন?

সন্ধ্যের ঠিক পরে।

সন্ধ্যের পরে তো কত লোকই আমার দোকানে আসে।

যারা আসে সবাইকে চিনি। ও লোকটা নতুন।

নতুন লোকও যে অনেক আসে।

গুটের ভণ্ডামি দেখে গা জ্বলে গেলো। বললাম, চালাকি কোরো না গুটে। সন্ধ্যের পর একটি মাত্র লোককে তুমি আমাদের বাড়ি দেখিয়েছিলে।

গুটে একটু ভাবার ভান করে বললো, তাই বলল। লোকটা এসে জানতে চাইলে চৌধুরীর বাড়ি আমি চিনি কিনা। বললাম, খুব চিনি। আমি না চিনলে আর কে চিনবে। বলে বাড়িটা দেখিয়ে দিলাম। কিন্তু তাতে কী হলো?

আমি বললাম, কিছু না।

বিকেলে বাড়ি এসে যা শুনলাম, তা শুধু বিশ্ব গোয়েন্দা সিরিজের বইতেই ঘটতে পারে। নিজ চোখে না দেখলে আমি বিশ্বাসই করতাম না।

সেজদি বললো, কোন সবুজ থাবা নামের কারা চিঠি পাঠিয়েছে–বিজুকে যদি অক্ষত অবস্থায় পেতে চাই তাহলে মড়াখেকোর মাঠের ঘোড়ানিম গাছের ফোকরে যেন এক হাজার টাকা রেখে আসে কেউ। নইলে ওকে সিঙ্গাপুরের এক ইন্টারন্যাশনাল চাইল্ড লিফটারের কাছে বিক্রি করে দেয়া হবে। থানা-পুলিশ করলে কোনো লাভ নেই। ওদের লোক সব লক্ষ্য করছে। রাজি থাকলে আজই যেন নিমতলায় কেউ গিয়ে ঠিক রাত বারোটার সময় তিনবার টর্চের বোতাম টেপে।

শুনতে শুনতে আমাদের চোখ ছানাবড়া হয়ে গেলো। সেজদি জেঠুর পকেট থেকে চিঠিটা চুরি করে এনে দেখালো। সেজদি যা বললো সেসব কথাই লেখা। শেষে ইতির জায়গায় সবুজ একটা হাতের ছাপ আঁকা।

আমি সেজদিকে বললাম, জেই কী বলেছে?

সেজদি বললো, বলবে আবার কী! থানায় গিয়েছিলো, দাবোগা বলেছে টর্চ জ্বালাতে। পুলিশের লোকরা সাদা কাপড়ে আশপাশে ঘোরাফেরা করবে।

থানা-পুলিশের ব্যাপারটা আমার ভাল লাগলো না।

ওদের শুধু তম্বি করাই সার। কবে যে ওরা আসল চোর ধরেছিলো সেটা আমি কেন কেউই জানে না। আমার শুধু মনে হচ্ছিলো গুটের উপর নজর রাখলেই বিজুকে পাওয়া যাবে। ও ছাড়া আর কেউ বিজুকে সরায় নি। এখন দেখতে হবে ও দূরে অন্য কোথাও সরিয়ে ফেলেছে কিনা।

কদিন আগে গুটে অকা সরকারকে বলেছিলো, ওর নাকি হাজার খানেক টাকা দরকার। কোথায় নাকি চালান আটকা পড়েছে। তাছাড়া দোকানও বড় করবে। এখন বিজুকে লুকিয়ে রেখে যদি টাকাটা পাওয়া যায়–মন্দ কি। ও ভাল করেই জানে, আমাদের গেঁয়ো শহরটার রহস্যভেদী কিরীটি রায় কিংবা

ব্যোমকেশ বক্সী কেউ বিজুকে উদ্ধার করতে আসবে না। দুদিন লাফিয়ে দারোগাও চুপ মেরে যাবে। তখন মায়ের কান্নার ঠেলায় সুড় সুড় করে জেঠু গিয়ে এক হাজারটি টাকা গুনে গুনে ঘোড়ানিম গাছের ফোকরে রেখে আসবেন। বুদ্ধিখানা মন্দ নয়। তবে ও হয়তো জানে না, আমি নিয়মিত রহস্যলহরী আর বিশ্ব গোয়েন্দা সিরিজ পড়ি।

তখনও সন্ধ্যে হয়নি, গুটেকে গিয়ে বললাম, কাল যে লোকটা আমাদের বাড়ি দেখতে চেয়েছিলো, সে সবুজ থাবার একখানা চিঠি রেখে গেছে।

আমি শুধু গুটের ভাবখানা দেখছিলাম।

গুটে কপালে চোখ তুলে বললো, সবুজ থাবা কে?

ভাবলাম এ-ও এক ন্যাকামো। বললাম, কোনো ছেলেধরার দল হবে। ওরা টাকা চেয়েছে।

গুটের চোখ যেন ঠিকরে বেরিয়ে আসবে–বিজুকে তাহলে ছেলেধরা ধরেছে? আমি মাথা নাড়লাম। গুটে অনেকক্ষণ চুপ থেকে বললো, বাড়ি যাও, আমি দেখছি।

গুটের কথায় আমি বাড়ি যাবোয় একটু দূর থেকে ওর দোকানটার ওপর নজর রাখলাম। গুটে দেখতে পেয়ে খেঁকিয়ে উঠলো, বাড়ি যেতে বলিনি তোমাকে? এখানে বসে গোয়েন্দাগিরি করা হচ্ছে? ভেঁপো ছেলে!

আমি চটে-মটে বাড়ি এসে ছাদে গিয়ে বসে রইলাম। রামুও উঠে এলো। বললো, পুলিশ মড়াখেকোর মাঠের চারপাশে থাকবে। যদি কাউকে সন্দেহ করে তাকে ধরবে।

আমি কোনো কথা না বলে গুটের দোকানটার দিকে তাকিয়ে রইলাম। অনেকক্ষণ বসেছিলাম। মাঝখানে একবার দিদা এসে খেতে নিয়ে গেলেন। খাবার পর আবার চিলেকোঠায় লেপ মুড়ি দিয়ে বসে রইলাম।

অনেক রাতে সেই লোকটা এলো। রাত তখন দশটা কি এগারোটা। গির্জার ঘন্টাটা ঠিক শুনতে পারি নি। লোকটা এসে গুটের দোকানের সামনে দাঁড়ালো। তারপর যখন দেখলো লোজন কেউ নেই, তখন মুখটা গুটের কানের কাছে নিয়ে কী যেন বললো। শুটেও কিছু বললো। বেশ কিছুক্ষণ ওদের ভেতর কথাবার্তা হলো। তারপর দেখি, গুটে দোকানের ঝাঁপ নামিয়ে লোকটার সঙ্গে বেরিয়ে এলো।

উত্তেজনায় আমি তখন রীতিমতো কাঁপছিলাম। রামুকে বললাম, দরজাটা বন্ধ করে দাও ভেতরে থেকে। আমি আসছি।

রামুর খুব বেশি ঘুম পেয়েছিলো। কোনো কথা না বলে দরজাটা বন্ধ করে দিলো। আমি চুপি চুপি বাইরে এসে একছুটে সদর রাস্তায়। দেখি গুটে আর সেই লোকটা হ হন্ করে লাহিড়ীপাড়ার দিকে যাচ্ছে। আমি বেশ দূর থেকে ওদের পিছু নিলাম।

লাহিড়ীপাড়ায় তেমন আলো নেই। বেশিরভাগ ল্যাম্পপোস্টেরই চিমনি ভাঙা। তাতে আমার সুবিধে হলো। ওরা আমাকে দেখতে পেলো না।

লাহিড়ীপাড়ার মাথায় একখানা ঘোড়ায় টানা পালকি গাড়ি দাঁড়িয়েছিলো। হঠাৎ দেখি সেই লোকটা পকেট থেকে একখানা কালো কাপড় বের করে গুটের চোখ দুটো বেঁধে দিলো। তারপর দুজনে পালকি গাড়িটায় উঠে বসলো। একছুটে আমিও পেছনের আসনটা ধরে ঝুলে পড়লাম।

আমি ভাবছিলাম, লোকটা গুটের চোখ বেঁধে দিলো কেন। এর কারণ দুটো হতে পারে। এক, ওরা দলের বিশ্বস্ত লোক ছাড়া অন্যদের আড্ডা চেনায় না। দুই, তা না হলে গুটে ওদের দলের লোক নয়। এই প্রথম যাচ্ছে।

লাহিড়ীপাড়ার পর আর কোনো আলো নেই। ঘুটঘুঁটে অন্ধকার। তবু এসব রাস্তা আমার মুখস্ত। কতবার হাজারীদের পুকুরে মাছ ধরতে গিয়েছি এখান দিয়ে। গাড়িটা লাহিড়ীপাড়া ছাড়িয়ে বকশীতলায় এলো। তারপর সেই অন্ধকারের চেয়েও অন্ধকার একটি ভাঙা বাড়ির সামনে এসে থামলো। যেটাকে আমরা সবাই পোদ্দারদের পোড়োবাড়ি বলেই জানি।

আমি কালো গাড়িটার গায়ের সাথে সেঁটে রইলাম। লোকটা গুটেকে ধরে নামালো। তারপর বাড়িটার ভেতরে নিয়ে গেলো। কিছু না ভেবে আমিও ওদের পিছু নিয়ে ঢুকে পড়লাম। তাড়াহুড়ো করে খালি পায়ে এসেছি বলে এতক্ষণ নিজের উপর ভারি রাগ হচ্ছিলো। এখন দেখি এটাই ভালো হয়েছে। যেভাবে পা টিপে টিপে হাঁটছিলাম তাতে মনে হলো মানুষ নই ভূত! একটুও শব্দ হচ্ছিলো না।

তেতলায় একটা ঘরে আলো জ্বলছিলো। লোকটা গুটের বাঁধন খুলে সে ঘরে নিয়ে গেলো।

দরজার ফুটো দিয়ে তাকিয়ে দেখি দুজন লোক ভেতরে বসে। বিচ্ছিরি চেহারার প্রতিযোগিতায় কে যে প্রথম হবে বলা মুশকিল। একজনের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে আরেকজনের গোঁফ গজিয়েছে। চোখ সবারই সমান–যেন দুটো করে লাল অঙ্গার বসানো। থ্যাবড়া নাক। দলের ভেতর যার গোঁফ সবচে বড়, আর যার মুখ সবচেয়ে থ্যাবড়া, তাকে গিয়ে লোকটা বললো, এরই কথা বলেছিলাম কত্তা। কাজে দেবে। বেশ চটপটে আছে। বাজিয়ে দেখেছি।

থ্যাবড়ামুখো গুটেকে ভাল করে দেখলো। গুটের চেহারাও ওদের চেয়ে কম নয়। তাই দেখে মাথা নাড়লো। বললো, হবে।

যে লোকটা ঘুঁটেকে এনেছিলো, সে বললো, বলতেই রাজি হয়ে গেছে। আরও বললো, আগে নাকি কালু শেখের দলে ছিলো।

শুটে একগাল হেসে বললো, কত্তা নিজেই বিবেচনা করুন। বাঘকে যদি দশদিন উপোস রেখে কেউ ঘাস খেতে দেয়, তাহলে যে অবিচার হয়। আমাদের রক্তে কি আর ঘাস খাওয়া আছে!

শুনে থ্যাবড়ামুখোর সে কি হাসি। বললো, বেড়ে বলতে পারিস তো! তা তোকে এখন ঘাসই খেতে হবে। আমাদের ও-বাড়িটার ওপর নজর রাখা দরকার। ওরা নাকি পুলিশে খবর দিয়েছে। পুলিশের যা বুদ্ধি! আমাদের লোক মনে করে মড়াখেকোর মাঠ থেকে পোদ্দারদের খোট্টা বামুনটাকে ধরে নিয়ে গেছে। ওই আমাশার রোগীটা কিনা আমাদের লোক! হেসে বাঁচি নে। যাকগে শোন, তুই ছোঁড়াটাকে নিয়ে নবীগঞ্জ চলে যা। আমাদের গাড়িতেই যাবি। সেখানে আমাদের লোক আছে। গাড়োয়ান চেনে। ওর হাতে তুলে দিবি। পালাবার চেষ্টা করো না বাপু। আমি শুখা গাড়োয়ান রেখেছি। ওর প্রাণে দয়ামায়া নেই। ভোজালি দিয়ে এফোঁড়-ওফোঁড় করে দেবে।

শুটে মুখ কালো করে বললো, কী যে বলেন কত্তা। এত অবিশ্বাস হলে কাজ চলে!

থ্যাবড়ামুখো ঠা ঠা করে হেসে বললো, এমনি বললাম। কিছু মনে করিস নে। কেলে, ছোঁড়াটাকে নিয়ে আয়।

কেলে নামের আরেক মুশকো বেরিয়ে গেলো। এত অন্ধকার ছিলো তবু যে কী করে পথ দেখে আমি ভেবেই পেলাম না। তবু রক্ষা আমাকে দেখতে পায়নি।

কিছুক্ষণ পর কেলে বিজুকে আনলো। বিজুর চেহারা দেখে আমি চমকে উঠলাম। মুখ শুকিয়ে আমসি হয়ে গেছে। নির্ঘাত সারাদিন ওকে খেতে দেয়নি। বিজু ফোঁপাচ্ছিলো। গুটেকে দেখে ভ্যাক করে কেঁদে ফেললো।

গুটের মুখটা মুহূর্তের জন্যে কেমন হয়ে গেলো। তারপরই এক ধমক-চুপ কর ছেঁড়া!

থ্যাবড়ামুখো হেসে বললো অমন করে ধমক দিসনে। তোর যা গলা! কখন আবার ছোঁড়াটা ভয়ে হার্টফেল করে বসবে! কালুর দলের লোক না হলে কি এমন হয়। তুই তাহলে এখনি চলে যা। কাল থেকে দোকানে বসি। যাবার সময় ঘরের দরজাটা ভেজিয়ে দিয়ে যা।

শুটে বিজুকে নিয়ে বাইরে এলো।

দরজাটা টেনে বন্ধ করলো। তারপর খুব আস্তে করে শেকলটা নামিয়ে দিলো। বুঝলাম গুটে ওদের দলের লোক নয়। তখনই আমি ওর সামনে এলাম। গুটে কি যেন বলতে যাবে, আমি ঠোঁটে আঙুল দিলাম।

এরপর যে কটা দরজা পড়লো, সবকটায় শেকল তুলে বন্ধ করে আমরা তিনজন এক তলায় নেমে এলাম।

গুর্খা গাড়োয়ান গাড়ি নিয়ে বসেছিলো। গুটে ফিসফিস করে বললো, এখান দিয়ে গেলে টের পেয়ে যাবে।

আমি বললাম, কি করবে তাহলে?

তোমরা এখানে দাঁড়াও। এই বলে গুটে বাইরে গিয়ে গাড়োয়ানকে ডাকলো–এই যে, এদিকে আসতে একটু আজ্ঞা হোক। কত্তা ডাকছেন।

গাড়োয়ানটা যেই কাছে এলো অমনি গুটে ওর ঘাড়ের ওপর আড়াইমণি এক রদ্দা মারলো।

গাড়োয়ান টাল সামলে পড়তে পড়তে উঠে দাঁড়ালো। গুটে বোধহয় এতটা ভাবতে পারেনি। তারপরই ও ঝাঁপিয়ে পড়লো গাড়োয়ানকে নিয়ে। দুজনে ভীষণ যুদ্ধ লেগে গেলো। কখনও গাড়োয়ান গুটের উপর, কখনও গুটে গাড়োয়ানের উপর।

আমি কি করবো, সহসা ঠিক করতে পারলাম না। হঠাৎ দেখি গাড়োয়ান গুটের ওপর বসে একখানা ভোজালি টেনে ওর বুকে বসাতে চাইছে আর গুটে প্রাণপণে ঠেকিয়ে রেখেছে। তক্ষুণি একখানা বড় ইট তুলে ঠকাশ করে গুখা গাড়োয়ানের মাথায় মারলাম। গাড়োয়ান সঙ্গে সঙ্গে দুহাত উপরে তুলে–আইবাপ, বলে গড়িয়ে পড়লো।

শুটে উঠে দাঁড়ালো। তার হাতে ভোজালির আঁচড়। দরদর করে রক্ত পড়ছে। আমাকে বললো, বিজুকে নিয়ে বাড়ি যাও। আমি থানায় যাচ্ছি।

বিজুকে নিয়ে যখন বাড়ি এলাম, তখন সবার সে কি আনন্দ। আমাদের দুজনকে কখনও জেঠু, কখনও দিদা টেনে হেঁচড়ে নাজেহাল করে ছাড়লেন। তারপর যখন বললাম, ঘুম পাচ্ছে–তখন দিদা সবাইকে ধমক দিয়ে সরিয়ে আমাদের কপালে চুমু খেয়ে বললেন, তাহলে শুতে যা।

শুয়ে শুয়ে বিজু বললো, কেমন করে থ্যাবড়ামুখো ওর পেয়ারা কিনবে বলে ভুলিয়ে পোড়া বাড়িতে নিয়েছিলো আর একটা ঘরে নিয়ে বেঁধে রেখেছিলো। সেসব কথায় রামু
এত উত্তেজিত হয়েছিলো যে, ওর মুখ দিয়ে একটা বাক্যও বেরলোলা না।

ঘুম থেকে উঠে সোজা গুটের বাড়িতে গেলাম। দেখি গুটে হাতে পট্টি বেঁধে শুয়ে আছে! বললাম, কেমন আছো গুটে?

একগাল হেসে গুটে বললো, ভালো। ওদের সব কটা ধরা পড়েছে। পুলিশ নিয়ে গিয়ে দেখি সবকটা তাস পিটাচ্ছে। শেকল বন্ধ যে টেরই পায়নি। দারোগা বললো, এদের ধরার জন্যে গরমেন্ট পুরস্কার ঘোষণা করেছিলো এক বছর আগে। ভারি শয়তান এই সবুজ থাবার দল। কি মজা, এক হাজার টাকা পাচ্ছি আমি।

বিজু বললো, সে টাকা দিয়ে তুমি লাটু, লেত্তি, বড়শি সব কিনে দোকানে রাখবে।

গুটে বললো, তা তো রাখবোই। তোমরা আমার কম ওবগার করোনি। তোমাদের জন্যেই তো টাকাটা পেলাম।

রামু বললো, তোমার জন্যে আমরা বিজুকে পেলাম। অথচ আগে তোমাকে কত কিছু ভেবেছিলাম।

বিজু বললো, তুমি কতো ভালো!

গুটে বললো, তোমরা আরও ভালো। আসলে সব ভালো যার শেষ ভালো।

সবাই কোরাসে গলা মিলিয়ে হেসে উঠলাম। হাসি থামিয়ে একসময় আমি বললাম, এবার বলো গুটে, সত্যি সত্যি তুমি কালু শেখের দলে ছিলে?

গুটে বললো, হায় কপাল! আমি কেন কালু শেখের দলে থাকবো? ও তো বানিয়ে বলেছিলাম। তারপর হেসে বললো, গোয়েন্দাগিরিতে তুমি এখনো কাঁচা রয়ে গেছো আবু।

সিয়ামিজ বেড়ালের লোম

ছোটবেলায় আমরা ছোট্ট এক পাহাড়ী শহরে থাকতাম। মনে করো তার নাম ছিলো র-নগর। সবাই বলে র-নগর ভারি চমৎকার জায়গা। এখান থেকে হিমালয় দেখা যায়। ঝাউ বনে শনশন বাতাস বয়। সুন্দর এক ফটিকজল ঝরনা আছে, যেখানে বেতো শরীরের বুড়োরা ঘন্টার পর ঘন্টা গা ডুবিয়ে বসে থাকে। র-নগরের চা আর কমলালেবুর নাকি বাইরে খুব নামডাক। এসব কথা লোকজন প্রায়ই বলাবলি করে। তবে আমরা কখনও সেসব নামডাক শোনার জন্যে বাইরে যাইনি।

আমরা মানে–আমি, রামু আর বিজু। জন্মের পর থেকে আমরা র-নগরের বাইরে পা রাখি নি। এখন আমরা সেভেন, এইটে পড়ি। আমাদের কাছে র-নগর ভারি বিচ্ছিরি জায়গা। এখানে ছবিঅলা বই

পাওয়া যায় না। শিলং-এ রিঙ্কুদের ওখানে চমৎকার : বিলেতি মার্বেল পাওয়া যায়। রিঙ্কু এনেছিলো একবার। আমরা পাকড়াশীদের দোকানে খুঁজে পাই নি। অথচ এই পাকড়াশীদের লাল টালির ছাদঅলা কাঠের দোকানটাই হচ্ছে র-নগরের সবচেয়ে বড় ভ্যারাইটি স্টোর। রিঙ্কু পাকড়াশীদের দোকান দেখে ঠোঁট উল্টে কত কী বলে গেলো। কী লজ্জার কথা বলো তো? তারপর ধরো, সবসময় লাটুও পাওয়া যায় না। বুড়ো পাকড়াশী বলে, লাটু নাকি বাইরে থেকে আনতে হয়। আর কাঠপেন্সিলের যা ছিরি–সে আর কী বলবো! ছোটকাকে যদি এ নিয়ে কিছু বলেছি, অমনি এক ধমক-বাজারে যা আছে তাই তো আনবো! আমার কি পেন্সিলের কারখানা আছে?

এবার তোমরাই বলল, কী করে আমরা র-নগরকে ভালো বলি! বুড়োরা এতো বাজে কথাও বলতে পারে! সন্ধ্যেবেলা অকা সরকারদের পুরোনো দিঘির চাতালে বসে র-নগরের বুড়োরা সবাই গল্প করে–এর মতো ভালো জায়গা পৃথিবীতে আর দ্বিতীয়টি নেই। তাজা ফলমূল আর তরকারি, চমৎকার স্বাদের মাছ, জুই ফুলের মতো ভাত, পাহাড়ী গরুর ঘন দুধ, এমনি সব বিষয় নিয়ে ওরা কথা বলে। সারাক্ষণ শুধু খাই খাই। বুড়োদের কথাই আলাদা।

আসলে র-নগরটা বলতে গেলে এক রকম বুড়োদেরই আড্ডাখানা। র-নগরে একটা ছবিঘর নেই এ কথা ওরা বলে না। অথচ রিঙ্কুদের ওখানে তিন তিনটে ছবিঘর। দিব্যি ছবি দেখে সবাই। রিঙ্কু বলে, ওদের ছবি নাকি কথা বলে। ছবিকে ওরা বলে টকি। আর আমাদের এখানে যা দেখি, সেসব হল বায়স্কোপ। কথা বলে না, শুধু ঠোঁট নাড়ে; নিচে লেখা ওঠে। তাও দেখি বছরে একবার, সেই পৌষের মেলাতে। বাইরে থেকে তখন সার্কাস, যাত্রা আর পুতুল নাচের দলের সঙ্গে ছবিঅলারা এসে তাঁবু খাটায়। দু আনা টিকিটে চাটাইয়ে বসে ছবি দেখায়। তিন আনা দিলে স্কুল থেকে ভাড়া করে আনা বেঞ্চিতে। আমরা বুঝি আর বেঞ্চিতে বসেছি! বুড়োরাই তো সবার আগে এসে ওখানে হাত-পা ছড়িয়ে কম্বল পেতে বসে থাকে। ছোটদের কেউ সেখানে বসতে গেলে বলে, তোরা আবার এখানে কেন, আমরা বুড়োরা দুটো সুখ-দুঃখের কথা কইবো।

আমাদের তাতে কোনো দুঃখ নেই। চাটাইয়ে বসে ছবি দেখতে দেখতে মনে হয় আমরা বুঝি আর এ পৃথিবীতে নেই। সে যে কী উত্তেজনা, বলে শেষ করা যাবে না। মেলার জন্যে আমরা প্রত্যেকে চার আনা করে পেতাম। দু আনায় বায়স্কোপ দেখতাম আর বাকি দু আনা দিয়ে এটা সেটা কিনতাম। সার্কাস দেখা হতো না। একবার বায়স্কোপের বদলে সার্কাস দেখেছিলাম, ভালো লাগে নি। পৌষমেলার

বায়স্কোপের দলটাই শুধু আমাদের মাতিয়ে রেখে যায়। তারপর স্কুল ছুটির বাকি একমাস ধরে তারই জের চলে। স্কুল খুললে আবার সেই একঘেয়েমি।

মেতে থাকার মতো আর কিছুই আমাদের জীবনে ঘটে না। বুড়োরা সকাল-সন্ধ্যা জটলা করে। আমরা রোজ কাঁধব্যাগে বই, খাতা, স্কেল, পেন্সিল আর টিফিনের বাক্স নিয়ে স্কুলে যাই। বিকেলের ঠাণ্ডা রোদে লাল সুরকি বিছানো পথ ধরে বাড়ি ফিরি। কোনোদিন রামু বিজু যায় মাছ ধরতে। আমি একখানা পুরোনো রহস্যলহরী কিংবা বিশ্বগোয়েন্দা সিরিজের বই নিয়ে পড়তে বসি।

সন্ধ্যের পর পচার মা যখন ঘরে হারিকেন জ্বালায়, তখন স্কুলের পড়া পড়তে হয়। পাশের ঘরে বসে তিনদিনের বাসী খবরের কাগজ পড়েন বড় জেঠুমণি। তাঁকে শুনিয়ে চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে মুখস্ত কবিতাটা কয়েকবার পড়ে দিদাকে ডেকে বলি, দিদা ভাত দাও।

জেঠু ওঘর থেকে বলেন, এত শিগগির কিসের ভাত? ইংরেজি পড়ো।

এরপর জেঠুকে শুনিয়ে কতক্ষণ বা বা ব্ল্যাকশিপ কিংবা মেরী হ্যাঁজ এ লিটল ল্যাম্ব পড়ি। তারপর আবার দিদা–।

ভাত খেয়ে আর পড়া নয়। সোজা লেপের তলায়। রাতে ভারি শীত! পড়বে না কেন বলো? হিমালয়ের একেবারে কাছেই যে! শীতে তো রীতিমতো ঘাসের ডগায় ভোরের শিশির বরফের কুচো হয়ে জমে থাকতো। পশমী ব্যাপার আর বানরটুপি পরেও ঠক্ ঠক্ করে দাঁতে দাঁতে শব্দ হতো।

র-নগরের বুড়োদের জীবনের মতোই যেন একঘেয়ে ছিল আমাদের দিনগুলো। মাঝে মাঝে হাঁপিয়ে উঠতাম। শুধু চাইতাম একটা কিছু হোক। হিমালয়ের চুড়োটা ভেঙে পড়ুক। কিংবা একটা বিরাট ভূমিকম্পে সব ওলটপালট হয়ে যাক। আমরা কজন শুধু প্রলয়ের পরে বইটার নায়কের মতো বেঁচে থাকি আর ইচ্ছেমতো ঘুরে বেড়াই। স্কুলে মাস্টারদের চোখ রাঙানি কিংবা বাড়িতে জেঠুর বকুনি কিছুই দেখতে বা শুনতে হবে না। কখনও ভাবতাম, হিমালয়ের ভয়ঙ্কর-এর মতো একটা তুষার মানব নেমে আসুক র-নগরে। এসে সব তোলপাড় করে দিক। কখনও যদি দূরের আকাশে একটা উড়োজাহাজ দেখতাম, তখনই ভাবতাম, আহা! একবার যদি ডানা ভেঙে পড়তো! সে রকম কিছুই হতো না সেই বুড়োটে শহর র-নগরে। তবে একদিন একটা আজগুবি কাণ্ড ঘটলো আমাদের বাড়িতে।

রোজ সকালের মতো দিদা এসেছেন আমাদের বিছানা গোটাতে। হৈ হৈ করে ধমক লাগালেন আমাদের সবাইকে। বিজুর জুলপি টেনে, রামুর গায়ের লেপটা উঠিয়ে, আমার কানে পালক দিয়ে সুড়সুড়ি দিয়ে যাচ্ছেতাই করতে লাগলেন।

দিদার ওই এক বদ অভ্যাস। বাড়িসুদ্ধ সবাইকে তিনি সাতসকালে ঘুম থেকে তুলে দেবেন। দারুণ বিচ্ছিরি ব্যাপার। মহা বিরক্তি নিয়ে আমরা তিনজন গায়ে র‍্যাপার জড়াচ্ছি, এমন সময় দিদা গলার শব্দটা ফাটা বাঁশের মতো করে বললেন–আঁ, এ কী রে!

কী হলো দিদা–বলে সবাই দিদার গায়ের ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়ি। দিদার হাতে কালো মতো কী যেন লাল সুতো দিয়ে বাঁধা। আমরা বললাম-ও কী দিদা?

দিদা ভুরু কপাল সব কুঁচকে একাকার করে বললেন–এ যেন কিসের লোম মনে হচ্ছে!

তাই তো! সবাই অবাক হয়ে চেয়ে দেখি, চকচকে কয়েক গাছি কালো লোম।

দিদা চোখ দুটো গোল করে বললেন–এগুলো এখানে এলো কী করে? তিনটে বালিশের তলায় তিনগোছা লোম! বল, কে রেখেছিস?

দিদার কথা শুনে সবাই আকাশ থেকে পড়লাম। তিনজন কোরাসে বললাম, কখনো আমরা এসব রাখি নি।

অবাক চোখে তিনজন একে অপরকে দেখলাম। দিদা আমাদের দিকে খানিকক্ষণ পিটপিট করে তাকিয়ে বললেন, তোরা রাখিস নি তো বাসাতে উড়ে এসেছে নাকি রে হতভাগার দল! বল কেন রেখেছিস?

আমি তো প্রায় কাঁদো কাঁদো–তুমি শুধু শুধু বকছো কেন? আমি বললাম কোথায় পাবো?

দিদা একটু নরম হয়ে বললেন-তুই রাখিস নি তো রামু রেখেছে। বলে দে রামু তুই রেখেছিস। এসব যে ভাল কাজ নয় সে তো তোরা জানিস নে।

রামু ঘোঁৎ ঘোঁৎ করে বললো–তুমি সবসময় আমকে সন্দ কর দিদা। মিছেমিছি আমাকে মার খাইয়ে যে তুমি মজা পাও, সে যেন আমি আর বুঝি না!

দিদা আরেক দফা চোখ পিটপিট করে আমাদের দেখলেন। তারপর গম্ভীর গলায় বললেন, কলতলায় যা।

কলতলা থেকে ফিরে আরেক দফা জেরা শুরু হলো। এবার জেঠুমণি। জেরার প্রশ্নও অনেক কঠিন। মার খাওয়ার ভয়ে বিজু তো কেঁদেই ফেললো। ওর কান্নার জন্যেই সে যাত্রা রেহাই পাওয়া গেলো।

প্রশ্নটা কিন্তু আমাদেরও। শুধু আমাদের তিনজনেরই বালিশের তলায় তিনগোছা লোম কোত্থেকে এলো? সঙ্গে আবার লাল সুতো বাঁধা? তোমরাই বলো, অযথা বকুনি শোনার জন্যে আমরা কেনই-বা

রাখতে যাবো এসব? কুকুরের হোক, বেড়ালের হোক কিংবা ছুঁচোরই হোক–এই লোম রেখে আমাদের কী লাভ?

আসল কথা হলো আমরা কেউ তা রাখি নি।

রামু গোল মুখটা আরও গোল করে বললো, সবই তো বুঝলাম, কিন্তু রাখলোটা কে?

আমি একটু ভেবে বললাম, সেটাই খুঁজে বের করতে হবে।

তিনজন স্কুলের পথে কাশফুলের ডাঁটা চিবোতে চিবোতে ভাবলাম, কে রাখতে পারে! স্কুলের বেঞ্চিতে বসে ভাবলাম, বাড়ি ফেরার পথে ভাবলাম, তবু কোনো হদিস পেলাম না।

বিকেলে বাড়ি ফিরে দেখি, সবখানে থমথমে ভাব। সবার মুখ শুকনো। রামু, বিজু রোজকার মতো ছিপ হাতে বাইতে বেরোবে, তখনই দিদা যেন মাটি খুঁড়ে বেরিয়ে এলেন। বললেন, কোথায় যাওয়া হচ্ছে?

রামু বললো, মাছ ধরতে।

কোথাও যেতে হবে না। চুপচাপ ঘরে বসে থাকো।

দিদার কথার ওপর বাড়ির কেউ কথা বলতে পারে না। রামু রেগেমেগে ধুপধাপ পা ফেলে চলে গেলো ভেতরে। বিজুও ওর সাথে মুখ কালো করে ঘরে ঢুকলো। আমার আর রহস্যলহরী সিরিজ পড়তে ভাল লাগলো না। এমনিতেই চারপাশে যা রহস্যের গন্ধ পাচ্ছিলাম, সে আর বলার নয়।

ভেতরের ঘরে দেখি, মা আর জেঠিমা গুজ গুজ করে কী যেন বলছেন। কান পেতে শুনি বড় জেঠিমা বলছেন, আমিও তাই ভাবছিলাম সেজো বৌ। বললে তো তোমরা বিশ্বেস করবে না। আমার বাপের বাড়িতে সেবার নিধু গয়লার জলজ্যান্ত জোয়ান ছেলেটা একদিন বলা নেই, কওয়া নেই, হুট করে মরে গেলো। আমরা তো ভারি অবাক! রোগ নেই, বালাই নেই, বলো কী? শেষে এলো বৈদ্য ওঝা। সব দেখেশুনে বললো, নির্ঘাত কেউ বাণ মেরেছে। সে আর কী বলবো ভাই! ওঝার কথামতো খুঁজতে গিয়ে সবাই দেখলো, নিধুর ছেলের ঘরের জানালার সাথে বাঁধা একগাছি লাল সুতো। ওঝা বললো–এই সুতো দিয়েই নাকি মন্ত্র-বাণ মেরেছে। সুতোর ভেতর দুটো গেরো দেখালো আমাদের।

জেঠিমার কথা শেষ হলে মা বললেন, আমিও এরকম একবার শুনেছিলাম। সেবার–।

মা-র কথা ছাপিয়ে আমার কানের কাছে দিদার গলা কট কট করে উঠলো। এক হাতে আমার একটা কান ধরে অপর হাতে থুতনি নেড়ে দিদা বললেন, আড়ি পেতে বড়দের কথা শোনা হচ্ছে হতচ্ছাড়া! কান আর মাথার সঙ্গে থাকবে না। কথা বলতে বলতে আমার কান দুটো বেশ আয়েশ করে মুচড়ে দিলেন দিদা।

রাগে দুঃখে তখন আমার যা কান্না পাচ্ছিলো সে আর কী বলবো! শুধু রামু, বিজু দেখে ফেলবে বলেই কাঁদলাম না। চুপচাপ দিদার সামনে থেকে সরে গেলাম। পাশের ঘরে যেতে গিয়ে শুনি দিদাও জেঠিমাদের আসরে বসে পড়েছেন।

একটু পরে দিদা আমাকে ডেকে বললেন–যা তো, একদৌড়ে পাশের বাড়ি থেকে হারুর মাকে ডেকে আন। আমার কথা বলবি!

হারুকাকার মায়ের সাথে দিদার ভারি খাতির। বুঝলাম, তাকে না হলে দিদার আসর ঠিকমতো জমবে না। আমি মুখ টিপে হেসে র‍্যাপারটা গায়ে জড়িয়ে বেরিয়ে পড়লাম।

হারুকাকাদের বাড়ি গিয়ে দেখি দিদার বন্ধুটি হাঁটু ভাঁজ করে জোড় হাতে বারান্দায় বসে আছেন। তাঁর সামনে বসা মাথায় বিশাল জটা আর মুখভর্তি লম্বা দাড়িঅলা এক সন্ন্যাসী। চুল-দাড়ি সব জট লেগে একাকার হয়ে গেছে। একটা চিমটে নেড়ে কী যেন বলছিলেন।

আমাকে দেখেই সন্ন্যাসীটি বিরক্ত হয়ে কটমট করে তাকালেন। ভারি এক তাকানেঅলা! আমি যেন তার পরোয়া করি! সটান গিয়ে হারুকাকার মাকে বললাম, দিদা যেতে বলছেন।

ঘরের ভেতর থেকে হারুকাকা ডাকলেন–আবু কথা শুনে যা।

হারুকাকার ঘরে ঢুকে দেখি, তিনি আয়নার সামনে বসে আয়েশ করে গোঁফে মোম মাখাচ্ছেন। আয়নায় মুখ রেখে বললেন–হ্যাঁ রে, অকাদের ঘেসেড়াটা বললো, তোদের বাড়িতে কী সব লোম নাকি পেয়েছিস তোরা!

আমি সব খুলে বললাম। লাল সুতোর কথা শুনে হারুকাকার হাত থেকে মোমের কৌটো খসে পড়লো। চোখ কপালে তুলে বললেন–আমাকে আগে খবর দিস নি কেন? এক্ষুণি চল, দেখে আসি।

হাত ধরে আমাকে একরকম টেনে-হেঁচড়ে হারুকাকা আমাদের বাড়িতে এলেন। দিদার কাছ থেকে তিনগোছা লোম আলোর সামনে ভালোভাবে নেড়েচেড়ে দেখে বললেন–এ তো বেড়ালের লোম মনে হচ্ছে!

দিদার চোখ দুটো তখন দেখার মতো হলো। বার কতক খাবি খেয়ে বললেন–বে-ডা-ল?

হারুকাকা মাথা নেড়ে সায় জানালেন–বেড়াল। তবে যে-সে বেড়াল নয়। এ হচ্ছে সিয়ামিজ বেড়ালের লেজের ডগার লোম। সাধারণ বেড়ালেরটা এতো কুচকুচে হয় না।

দিদা আরও কয়েক দফা খাবি খেয়ে বললেন, কী মিজ বললে বাবা?

হারুকাকা কাষ্ঠ হাসলেন–সিয়ামিজ। ভারি দুর্লভ জাতের বেড়াল। আমাদের দেশে দেখাই যায় না।

দিদা তেমনি অবাক হয়ে বললেন, কী হয় বাবা ওই সিয়ামিজ বেড়াল দিয়ে?

হারুকাকা এবার ঢোক গিললেন। আশপাশে চোখ বুলিয়ে চাপা গলায় বললেন, আমি তো জানি এ বেড়াল সাধারণ লোকে পোষে না। আগেকার দিনে ডাইনীদের কাজে লাগতো।

হারুকাকার কথা শুনে মা, দিদা আর জেঠিমাদের চোখগুলো ঠিকরে বেরিয়ে আসতে চাইলো। বড় জেঠিমা আর দিদা ভাঙা গলায় একসঙ্গে বললেন, ডাইনী?

হারুকাকা এবার শুধু মাথা নেড়ে সায় জানালেন। কেউ কোনো কথা বললো না। সবাই চুপচাপ শুকনো মুখে বসে রইলো। কিছুক্ষণ পর হারুকাকা—তোমরা সবাই সাবধানে থেকো, বলে চলে গেলেন।

ভয়ে সবার হাত-পা সেঁধিয়ে গেছে। একি অলুক্ষণে ব্যাপার? ডাইনীদের বেড়ালের লোম–যা তা কিছু নয়! কিন্তু ডাইনী এলো কোত্থেকে?

বেশ রাতে দিদাদের সভা ভাঙলো। দিদা আমাকে ডেকে বললেন–একটা হারিকেন আর লাঠি হাতে তুই আর রামু গিয়ে হারুর মাকে ওদের বাড়িতে রেখে আয়।

রামু ভূত-টুত মানে না। তবু দেখলাম, ও যেন একটু দমে গেছে। দুজনে হারুকাকাদের বাড়ি থেকে ফেরার পথে চুপচাপ হাঁটছিলাম। একসময় রামু বললো, আসলে ডাইনী–ফাইনী কিছু নয়। কোনো খারাপ লোক বাজে মতলব হাসিল করার জন্যে এসব করেছে।

আমি মাথা নেড়ে বললাম, আমারও তাই মনে হয়। তবে বানরের থাবা গল্পটা তো তুই পড়েছিস। সেখানে কিন্তু অন্যরকম ছিলো। এ ধরনের কিছু দেখা মানে নির্ঘাত কোনো মৃত্যুর খবর শোনার লক্ষণ।

রামু শুধু বললো, দেখা যাক কী হয়!

পরদিন অবাক কাণ্ড! হারুকাকার মা ভোর না হতেই ছুটতে ছুটতে আমাদের বাড়িতে এলেন। আমি তখন কলতলায় যাচ্ছি। বললেন, হ্যাঁরে ছোঁড়া, তোর দিদা কোথায় রে?

আমি ভেতরে দেখিয়ে দিলাম। রামু, বিজু এগিয়ে এলো–কী হয়েছে?

আমি ঠোঁট উল্টে বললাম, কী জানি!

আমরা তিনজন অবাক হয়ে দিদার ঘরে গেলাম। শুনলাম, আজ সকালে হারুকাকাদের বাড়ির সবার বালিশের তলায় নাকি লাল সুতোয় বাঁধা সিয়ামিজ বেড়ালের লোম পাওয়া গেছে।

বাড়িতে সবার মুখ শুকিয়ে আমসত্ত্ব। সকালে কোনো খাবার তৈরি হলো না। শুধু মুড়ি খেয়ে স্কুলে গেলাম। হারুকাকার ছেলে কথাটা সারা স্কুলে রটিয়ে দিলো। আমাদের তখন হাজারটা জেরা করা হলো।

বাড়ি ফিরে দেখি মেঘ কাটে নি। সবার মুখ থম থম করছে। দিদা সন্ধ্যে না হতেই আমাদের গম্ভীর মুখে বললেন, তাড়াতাড়ি ভাত খেয়ে শুয়ে পড়ো, ভয়ানক কিছু ঘটতে পারে।

আমরা শুয়ে শুয়ে আকাশ-পাতাল ভাবলাম। কোনো কুল-কিনারা পেলাম না।

তার পরদিন যে কাণ্ড ঘটলো, র-নগরের ইতিহাসে কেউ অমনটি শুনেছে কিনা বলতে পারবে না। র-নগরের দামপাড়া, মধুবাড়িয়া, সেন্ট জন স্ট্রিট, শালতলা–সবখানে কম করে হলেও তিরিশটা বাড়িতে খবর পাওয়া গেল, লাল সুতোয় বাঁধা সিয়ামিজ বেড়ালের লোমের গোছা পাওয়া গেছে সবার বালিশের তলায়। র-নগররের জীবনে এমন আজগুবি ঘটনা কখনও ঘটে নি। পথে-ঘাটে সবখানে লোকজন শুকনো মুখে ফিসফিসে গলায় একে অপরকে প্রশ্ন করছে–এটা কিসের ইঙ্গিত? র-নগরের ওপর কি কোনো অশুভ শক্তির দৃষ্টি পড়েছে?

স্কুলে মহা হইচই। ক্লাশে কোনো পড়া হলো না। শুধু সিয়ামিজ বেড়ালের নোম নিয়েই কথা হলো। টিচাররা সবাইকে সম্ভাব্য বিপদ সম্পর্কে সতর্ক থাকতে বললেন। আমাদের বাড়িতে প্রথম দেখা গিয়েছিলো। সেজন্যে বেশি চাপ পড়তে লাগলো আমাদের ওপর। বেশ কয়েকজন টিচার স্কুলে আসেন নি। সেদিন আমাদের হাফ-স্কুল হলো। স্কুল থেকে বেরোবার সময় দেখলাম, আমাদের বুড়ো দপ্তরি ডেসমন ছুটির জন্যে ব্রাদার হামফ্রেকে ধরে হাউমাউ করে কাঁদছে।

বাড়ি গিয়ে ভয়ানক এক খবর শুনলাম। অকা সরকারদের বড় গিন্নির মোল ভরির এক চন্দ্রহার আর আটভরির দুই মকরমুখো বালা চুরি গেছে। গত রাতে তাঁর বালিশের তলায়ও নাকি লাল সুতোয় বাঁধা সিয়ামিজ বেড়ালের লোম পাওয়া গিয়েছিলো। অকা সরকারদের বাড়ির পল্টা এসে আমসি মুখে খবরটা জানিয়ে গেলো আমাদের বাসার সবাইকে। দারোগা নাকি সবাইকে জেরা করে ওদের রাধুনিকে নিয়ে হাজতে পুরেছে।

বিকেলে সরকারদের বড় গিন্নি এলেন দিদার কাছে। আরও এলেন হারুকাকার মা, দামপাড়ার হালদার দাদু, সেন্ট জন স্ট্রিটের মিসেস দুবে–সব মিলিয়ে দশ বারোজন বুড়ো-বুড়ি। মা আর জেঠিমারা অনবরত পান সেজে দিচ্ছেন আর চা বানাচ্ছেন। দিদা আসর জাঁকিয়ে বসেছেন।

হালদার দাদু হচ্ছেন র-নগরের সবচেয়ে বুড়ো মানুষ। সবার অনেক কথার শেষে তিনি বললেন, আপনারা সবাই বুঝতে পারছেন, এর পেছনে একটা অশুভ শক্তি কাজ করছে। কোনো অপদেবতা বা গ্রহ যদি কুপিত হন, তাহলে এমন ঘটতে পারে। আমার মনে হয় অবিলম্বে এর একটা বিধান হওয়া উচিত।

কয়েকজন কোরাসে জানতে চাইলেন–বিধানটা কী?

হালদার দাদু গম্ভীর হয়ে বললেন–বলছি, ধৈর্য ধরুন। আপনারা রামনাঙ্গা পাহাড়ে তো অনেকেই গেছেন। আমাদের দামপাড়া থেকে মাত্র তিন মাইল হবে। সেখানে থাকেন হারিয়াম্পা মায়ী। তার মতো সিদ্ধ তপস্বিনী খুব কমই আছেন। আমরা তার কাছেই এর বিধান চাইবো। তিনি ছাড়া আর কেউ এ বিপদ থেকে আমাদের উদ্ধার করতে পারবেন না।

হারুকাকার মা বললেন, কিন্তু আমি যে আমাদের সন্ন্যাসী বাবার কাছে বিধান চেয়ে বসে আছি।

থাকুন গে বসে! বিরক্ত হয়ে হালদার দাদু বললেন, এর বিধান যার তার পক্ষে দেয়া সম্ভব নয়। কারণ, এ বেড়াল যে-সে ডাইনীর নয়। আমি বুঝতে পারছি, এ হচ্ছে সেই তিব্বতী ডাইনীর কাজ, আমার ঠাকুরদা যার কথা বলেছিলেন। র-নগরের পত্তনের সময় থেকে সেই ডাইনী গোটা শহরটার ওপর চটে আছে।

হারুকাকার মা এরপর আর কোনো কথা বললেন না। হালদার দাদু আবার বললেন, আপনারা কে কে যাবেন হারিয়াম্পা মায়ীর কাছে?

অকা সরকারদের বড় গিন্নি অলঙ্কারের শোকে কাঁদো-কাঁদো মুখে বসেছিলেন এক কোণে। মাঝে মাঝে রুমালে ফোৎ ফোৎ করে নাক ঝাড়ছিলেন। তিনি ধরা গলায় বললেন, আমি যাবো।

তার সঙ্গে সঙ্গে দিদা আর মিসেস দুবেও সাড়া দিলেন। মিটিং-এ ঠিক হলো হালদার দাদুর সঙ্গে এই তিনজনই যাবেন হারিয়াম্পা মায়ীর কাছে।

দিদা আমাকে ডেকে মাথায় হাত বুলিয়ে বললেন, ওরে মেনি বাঁদর, তুই একটা ভালো জামা পরে আয়। আমার সাথে যাবি।

আমি জানতাম দিদা যা ভীতু–আমাদের একজনকে সঙ্গে নেবেনই। ঝটপট তৈরি হয়ে নিলাম। দিদা শুধু গায়ে একটা আলোয়ান জড়িয়ে নিলেন। হালদার দাদুরা তো তৈরি হয়েই এসেছিলেন।

শেষ বিকেলে একটা ঘোড়ার গাড়িতে করে আমরা হারিয়াম্পা মায়ীর রামনাঙ্গা পাহাড়ে গেলাম। দিদাদের মুখ শুকিয়ে এতটুকু হয়ে গেছে। আমারও রীতিমতো গা ছমছম করছিলো।

রামনাঙ্গা পাহাড়ের একটা মস্ত গুহার ভেতরে থাকেন হারিয়াম্পা মায়ী। গুহার ভেতর ঢুকতেই সুড়ুৎ করে পাশ দিয়ে সবুজ চোখঅলা একটা নীল শেয়াল বেরিয়ে গেলো। আর সঙ্গে সঙ্গে দাঁড়ে বাঁধা একটা লাল-নীল তোতা পাখি কে-কে-কে-কে বলে ডানা ঝটপট করে ডেকে উঠলো।

হালদার দাদু ইশারায় আমাদের থামতে বললেন। ভেতর থেকে কে যেন চিলের মতো তীক্ষ্ণ গলায় বললো–কিয়ারে ডাকিনী? কৌন আয়ারে?

বলতে বলতে গুহার অন্ধকার কোণ থেকে বেরিয়ে এলো হারিয়াম্পা মায়ী। চেহারা দেখে বলা যাবে না বয়স দেড়শো না দুশো। যে চুলগুলো এককালে শাদা ছিলো সেগুলো মরচে-পড়া পুরানো লোহার মতো দেখাচ্ছে। চামড়া ঝুলে পড়েছে। নাকটা রামদার মতো বাঁকানো। চোখের কোটরে যেন দুটো সবুজ পাথর বসানো–জ্বল জ্বল করে তাকিয়ে দেখছিলো আমাদের। আমার মনে হল হারিয়াম্পা মায়ী নিশ্চয়ই তিব্বতী ডাইনীটার বোন-টোন হবে।

হালদার দাদু এগিয়ে গিয়ে তার কানে কানে কি যেন বললেন। শুনে হারিয়াম্পা মায়ী খিক খিক করে হেসে দাঁড়ে বাধা তোতা পাখিটার দিকে তাকালো। সঙ্গে সঙ্গে তোতা পাখিটাও ক্কি-ক্কি-ক্কি করে বিকট স্বরে ডেকে উঠলো। তারপর হারিয়াম্পা মায়ী ইশারায় আমাদের ভেতরে যেতে বললো।

ভেতরে বেশ ভোলা খানিকটা জায়গা। চারপাশে হাজারো রকমের লতাপাতা ঝোলানো। থেকে থেকে অল্প বাতাসে কিলবিল নড়ছিলো সাপের মতো। হালদার দাদু পরে আমাদের বলেছেন, ওগুলো নাকি আসলেই ছিলো সবুজ সাপ। গুহার ভেতর উনুনের মতো একটু জায়গা দাউ দাউ করে আগুন জ্বলছিলো। সেই আগুনের উপর বসানো মস্ত এক কড়াইতে টগবগ করে কি যেন ফুটছিলো।

হারিয়াম্পা মায়ী সেই কড়াইতে শাদা মতো কিসের গুঁড়ো ছড়িয়ে দিলো। তারপর বিচিত্র সব শব্দের মন্ত্র পড়া আরম্ভ করলো। কড়াই থেকে শাদা ধুয়োর আড়ালে হারিয়াম্পা মায়ীকে তখন দেখা যাচ্ছিলো না। শুধু বিড়বিড় করে মন্ত্র পড়ার শব্দ হচ্ছিলো। হালদার দাদু একটু কেশে উঠতেই প্রচণ্ড ধমকে খেলেন–খামোশ!

আমার অবস্থা তো বুঝতেই পারছো। শক্ত করে দিদা আমার হাত ধরেছিলেন, তারপরও ঠক্ ঠক্ করে কাঁপছিলাম। আসলে হারিয়াম্পা মায়ীকে একটা ডাইনী ছাড়া আর কিছুই ভাবতে পারছিলাম না আমি।

কিছুক্ষণ পর মন্ত্র পড়া শেষ হলো। শাদা ধোঁয়া কেটে গেলো। হারিয়াম্পা মায়ী আমাদের দিকে তাকিয়ে বললো, কিসকা জেবর?

হালদার দাদু অকা সরকারদের বড় গিন্নিকে দেখিয়ে দিলেন। তখন হারিয়াম্পা মায়ী কাঠের বারকোশে করে সেই কড়াই থেকে থকথকে কালো মতো কী যেন তুললো। দেখে মনে হলো সেখানে ছুঁচো, চামচিকে, সাপ, ব্যাঙ, টিকটিকি সব কিছুই থাকতে পারে। বারকোশের ভেতর ছুঁচোর লেজের মতো কি যেন দেখাও যাচ্ছিলো।

বড় গিন্নির কাছে এসে হারিয়াম্পা মায়ী বারকোশটা এগিয়ে দিয়ে খনখনে গলায় বললো, পিয়ো।

বড় গিন্নি ভয়ে ভয়ে হালদার দাদুর দিকে তাকালেন। হালদার দাদু তাকে সাহস দিয়ে বললেন, ভয় কি, খেয়ে নিন, গয়না–।

হালদার দাদুর কথার মাঝখানে হারিয়াম্পা মায়ী তার দিকে কটমট করে তাকিয়ে বাজখাই গলায় ধমক দিলো–খামোশ! তারপর চোখ পাকিয়ে গিন্নিকে বললো, পিয়ো।

হালদার দাদুর শুকনো মুখের দিকে আরেকবার তাকিয়ে বড় গিন্নি মুখখানা কাঁদো : কাঁদো করে সেই থকথকে কালো সুপ ঢক ঢক করে খেয়ে ফেললেন।

হারিয়াম্পা মায়ী খনখনে গলায় বড় গিন্নিকে বললো–জেবর মিল যায়গা।

হালদার দাদু তখন দাঁড়ে বাঁধা তোতার মুখে একখানা দশ টাকার নোট ধরিয়ে দিলেন। আমরা বেরিয়ে এলাম ডাইনীর গুহা থেকে।

ঘোড়ার গাড়ি আমাদের জন্যে দাঁড়িয়েছিলো। গাড়িতে ওঠেমিসেস দুবে বললেন, মিসেস সরকার কী করে যে খেলেন, মাই গুডনেস!

লজ্জায় বড় গিন্নির মুখ লাল। হালদার দাদু গম্ভীর হয়ে বললেন, উনি অলঙ্কার পেয়ে যাবেন।

চারদিকে অলঙ্কারের জন্যে র-নগরে তোলপাড় শুরু হয়ে গেছে। র-নগরে সবাই জানে কোনো চোর-ডাকাত নেই। দু একটা ঘটিবাটি কেউ ভুল করে নিয়ে যেতে পারে। তাই বলে চব্বিশ ভরি সোনার গয়না চুরি যাবে এতো সোজা কথা নয়!

র-নগরের জীবনে কিছু ঘটে না বলে আমার ভারি দুঃখ ছিলো! আমি চাইতাম একটা কিছু ঘটুক। তাই বলে এতো বড় অঘটন এটা আমি চাই নি।

র-নগরের সবখানে এই ঘটনাটি আলোচনার প্রধান বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছিলো। আমরা তিনজনও বড়দের মতো গম্ভীর মুখে এ নিয়ে আলোচনায় বসতাম। এখন আর সিয়ামিজ বেড়ালের লোম দেখা যায় না বটে, তবে মিসেস দুবের হিরের কানফুল চুরি গেছে এটা কানে এলো। সবাই জানে, এই অলঙ্কার চুরি কিংবা উধাও হয়ে যাওয়ার সঙ্গে সিয়ামিজ বেড়ালের লোমের একটা সম্পর্ক আছে।

হালদার দাদু মিসেস দুবেকে হারিয়াম্পা মায়ীর কথা বলাতে তিনি আঁতকে উঠেছেন মাই গুডনেস বলে। মিসেস দুবের ভঙ্গি দেখে হালদার দাদুর সে কী রাগ। বার বার বললেন–অলঙ্কার পেলে সরকার গিন্নিই পাবেন।

রামু একদিন বললোহারে, রাতে পাহারা দিলে কেমন হয়? বিজু বললো, কিছু না জেনে কোথায় পাহারা দিবি শুনি। বাড়ি তো অনেক। রামু চুপসে গিয়ে বললো, তাও তো কথা!

গোয়েন্দা সিরিজ আমি কম পড়িনি! মাতব্বরিটা নিলাম–সোজা হিসেব! গয়না চুরি হচ্ছে তাদেরই যাদের বাড়িতে সিয়ামিজ বেড়ালের লোম পাওয়া গেছে। শালতলার সরকারদের বাড়ি চুরি হয়েছে। সেন্ট জন স্ট্রিটের মিসেস দুবের চুরি হয়েছে। এই দুই পাড়া বাদ দিলে বাকি থাকে মধুবাড়িয়া, দামপাড়া আর আমাদের পাড়া। মধুবাড়িয়ায় চুরি করার মতো সেরকম কোনো বাড়ি নেই। সুতরাং আমরা আমাদের পাড়া আর দামপাড়ায় পাহারার ব্যবস্থা করতে পারি। দামপাড়ার ভার হালদার দাদুর ওপর ছেড়ে দেয়া যায়। আমরা আপাতত আমাদের পাড়াই পাহারা দেবো।

চমৎকার বলেছিস। আমার মাথায় চাটি মেরে লাফিয়ে উঠলো রামু। যদিও চাটিটা আমার পছন্দ ছিলো না, তবু রামুর প্রশংসার বদলে ওটা মেনে নিতে হলো।

আমাদের দারোগা মশাই সারা র-নগরে একাই একশো হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছিলেন। যেখানেই যাই সেখানেই বিশ্বাস দারোগা। সবখানে তার এক কথা–আঁ, আমার র-নগরে চুরি বাটপারি! তুর্কি নাচন নাচাবো না!

সবখানে খবরাখবর নেয়া হচ্ছে এ কদিনে নতুন মানুষ কে কে এসেছে র-নগরে। সরকারদের নতুন কাজের লোক উড়ে বামুনটার সে যা দুরবস্থা! দিনে কম করে হলেও তাকে দশবার বিশ্বাস দারোগার জেরা সামলাতে হচ্ছে।

আমাদের বাড়িতে দিদা কোত্থেকে যেন একটা মুশকিল আসান ফকির ধরে এনেছেন। লাল ফেজের টুপি মাথায়, দাড়ি, জোব্বাঅলা একটা লোক গলায় হরেক রকম তবি ঝুলিয়ে দিদাকে জ্ঞান দিতে বসেছে। দিদা ভক্তিভরে তার সেবা করছেন আর বাসার সবাইকে ধমক দিচ্ছেন।

আমরা আমাদের পরিকল্পনা মতো কাজে নামলাম। রাতে ঠিক করলাম, খান বাহাদুরদের আস্তাবলে বসেই পাহারা দেবো। আস্তাবলটা এমন এক জায়গায় যেখানে থেকে পাড়ার সব বাড়ি দেখা যায়। আমাদের প্রধান লক্ষ্য হচ্ছে, হারুকাকা আর আমাদের বাড়ি। আমি অবশ্য হারুকাকার বাড়ির ওপর বেশি নজর দেয়ার পক্ষপাতী ছিলাম।

আমরা তিনজন তিনখানা কম্বল জড়িয়ে আস্তাবলের পাশে নিশিন্দে গাছের ঝোঁপের নিচে বসলাম। রাত বাড়তে লাগলো। চোখ দুটো টান টান করে জেগে রইলাম। হঠাৎ মাঝরাতে রামুর খোঁচা খেয়ে উঠে বসতে হলো। দেখি, হারুকাকাদের বাড়ি থেকে সেই সন্ন্যাসী ঠাকুর বেরিয়ে যাচ্ছেন। বিজু ফিসফিস করে বললো, এভাবে খোঁচাচ্ছিস কেন, ওটা তো সেই সন্ন্যাসীটা!

আমি অবাক হয়ে ভাবলাম, হারুকাকার মা-র এতো সন্ন্যাসী সেবার বাতিক অথচ ঠাকুর মশাইকে রাতে বাড়িতে না রেখে এই শীতের ভেতর এভাবে যেতে দিলেন! যাক, ওদের বাড়ির লোকজন তাহলে এতক্ষণ জেগেই ছিলো।

আবার একটানা তাকিয়ে থাকতে থাকতে কখন যে ঘুমিয়ে পড়েছি টেরই পেলাম । যখন ঘুম ভাঙলো, তখন দেখি, আমার আর রামুর কান দুটো জেঠুর দু হাতের মুঠোয়।

বাছাধনেরা তাহলে সারারাত আস্তাবলে ছিলে? আমি ওদিকে সারা বাড়ি খুঁজে মরি। খানদের বেতো ঘোড়ার সঙ্গে এত কিসের খাতির! বাড়ি চল। আজ যদি বেতিয়ে তোদের পিঠের চামড়া না তুলি তাহলে–এই বলে জেঠু আমাদের কান ধরে হিড় হিড় করে টেনে বাড়ি নিয়ে এলেন।

আমাদের মুখ শুকিয়ে কাঠ। আজ নির্ঘাত পিঠের ওপর তিনটে বেত ভাঙবে। কেন যে মিছেমিছি রাত পাহারার শখ হলো তাই ভাবছিলাম। কোনো লাভই তো হলো না। মাঝখান থেকে বরং এই হেনস্তা।

জেঠু সপাং করে বেতখানা বাতাসে নাচালেন। ঠিক তক্ষুণি হারুকাকার মা ছুটে এসে হাউমাউ করে বললেন, বাবা হাবু! আমার সব্বোনাশ হয়ে গেছে। কাল রাতে আমার বৌমার গয়নার বাক্স চুরি হয়ে গেছে। আমার কী হবে গো। হাউ, হাউ, হাউ! হারুকাকার মায়ের সে কি কান্না!

আমার মাথায় বিদ্যুতের চমকের মতোই চিন্তাটা এলো। বললাম, কাল রাতে কি আপনাদের বাড়িতে সন্ন্যাসী ঠাকুর এসেছিলেন?

হারুকাকার মা কাঁদতে কাঁদতে বললেন, তিনি তো সেই যে গেলেন, তিন দিন হয়ে গেলো আর এলেন না। ভাবছিলাম তাকে পেলে কুপিত গ্রহ বশ করাবো। তার আগেই–হাউ হাউ হাউ।

আমি রামুকে তখন এক ঝটকা মেরে টেনে বললাম, এখনই থানায় চল। ডাকাতের খোঁজ পেয়ে গেছি। একছুটে থানায় এসে রুদ্ধশ্বাসে বিশ্বাস দারোগাকে সব খুলে বললাম।

তাই নাকি! বলে ছিটকে বেরিয়ে এলেন দারোগা মশাই। বললেন, আমি জানি হারামজাদা কোথায় থাকে! রণধীর সিং! আকবর আলী! জলদী আও!

সন্ন্যাসীকে ধরতে বেশি বেগ পেতে হলো না। সবই পাওয়া গেলো। শুধু মিসেস দুবের হিরের দুল জোড়া ছাড়া। জেরা করে জানা গেলো ওটা সন্ন্যাসীর এক চ্যালার কাছে রয়েছে।

হালদার দাদু বললেন, তখনই মিসেস দুবেকে বলেছিলাম হারিয়া মায়ীর কাছে যেতে।

মিসেস দুবে কী আর করেন! হালদার দাদুর সঙ্গে গিয়ে হারিয়াম্পা মায়ীর সেই বীভৎস সুপ খেয়ে এলেন। আর কি আশ্চর্য, ঠিক তার পরদিনই সন্ন্যাসীর সেই চ্যালাটি দুলসমেত ধরা পড়লো। তখন আমাদের বুড়ো হালদার দাদুর লাফানো দেখে কে!

র-নগরের ঘটনা এরপরও কিছু বাকি ছিলো। চোর ধরা পড়ার আনন্দে আমরা সবাই একদিন হিমঝোরায় বনভোজনে গেলাম। বনভোজনের অর্ধেক চাঁদাই দিয়েছিলেন সরকার গিন্নি। বিশাল বপু নিয়ে তিনি একাই এর আয়োজন করলেন। হিমঝোরার ঝাউবনে আমরা বাকি রহস্যটুকু জানতে পারলাম। সেটা হল সিয়ামিজ বেড়ালের নোমর রহস্য।

আমরা ছোটরা সবাই দূরে দল বেঁধে বসে এ নিয়ে আলাপ করছিলাম। ওরা কেউ হারিয়া মায়ীর কথা জানে না। সবাইকে হারিয়াম্পা মায়ীর গল্প শুনিয়ে বাহাদুরি দেখানোর জন্য বললাম, বুড়ি বলেছে এ লোম হচ্ছে তিব্বতের লুসাংপি নামে এক পাজি ডাইনীর পোষা বেড়ালের। এই লোম দেখা মানে একটা দুর্ঘটনা ঘটবেই। আমাদের তো অল্পের ওপর দিয়ে গেছে। আরও বড় দুর্ঘটনা ঘটতে পারতো। গয়না চুরির সঙ্গে ডাইনীর বেড়ালের লোমের একটা সম্পর্ক আছে।

অকা সরকারদের পল্টা বললো–বুড়ি জানে কচু আর ঘন্টা। আমাদের বাড়িতে সবার দেখাদেখি আমিই তো রামছাগলের লোম লাল সুতো দিয়ে বেঁধে জেঠিমার বালিশের তলায় রেখেছিলাম। জেঠিমা যা ভীরু, কী করেন তাই দেখার জন্যে মজা করছিলাম।

মিসেস দুবের ভাইপো ইভু সঙ্গে সঙ্গে বললো, আমাদের বাড়িতে পিসিমার বালিশের তলায় আমি রেখেছিলাম।

হারুকাকার ছেলে বললো, আমাদের বাড়িতে আমি রেখেছিলাম।

সবার তখন কী তুমুল হাসি। হাসতে হাসতে সবাই স্বীকার করলো–এসব ডাইনী-টাইনীর ব্যাপার যে কি রকম ফালতু এ থেকেই সেটা প্রমাণ হয়। আমাদের মজার ব্যাপারটা বুড়োদের কী রকম নাজেহাল করে ছেড়েছে। উচিত শিক্ষা হয়েছে। ডাইনী, মন্ত্র এসব বিশ্বাস করলে এমনই হয়।

আমি নিজেও এরকমই ভেবেছিলাম। বুড়োদের এই ভয় আর কুসংস্কারের সুযোগ নিয়েছিলো পাজি সন্ন্যাসীটা। রামুকে বললাম–শুধু আমি নই। আমরা সবাই চেয়েছিলাম র-নগরে একটা কিছু ঘটুক। নইলে সবার মাথায় কেন লোম রাখার বুদ্ধি আসবে?

পল্টা আর ইভুরা সেটা স্বীকার করলো। পল্টা বললো, তোদের বাড়িতেই তো পয়লা ঘটলো। তুই-ই তাহলে শুরু করেছিলি?

আমি হেসে বললাম, সেটা কোনো তিব্বতী ডাইনীর সিয়ামিজ বেড়ালের লোম নয়। বড় জেঠুর পুরোনো জুতোর বুরুশের লোম।

পল্টা বললো-আহা, রামছাগলও নয়!

সবাই হাসতে হাসতে গড়াগড়ি খেলাম। তবে সবশেষে সবাই মিলে ঠিক করলাম, বুড়োদের কানে যেন এসব কথা না যায়। ওরা ভাবছে এসব সন্ন্যাসীর কাজ। ভয় দেখাবার জন্যে সন্ন্যাসী ঠাকুরই বুঝি এসব চালান দিয়েছে। তাই ভাবুক ওরা। আসল ঘটনা জানতে পারলে কারও কানই যে মাথার সঙ্গে থাকবে না, এ বিষয়ে সবাই একমত হলাম।